আহমদ চরিত

(হযরত মসীহ্ মাওউদ [আ.]-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী)

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলিফা

আহ্‌মদ চরিত

(হযরত মসীহ্ মাওউদ [আ.] এর সংক্ষিপ্ত জীবনী)

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ

খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)

নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলিফা

প্রকাশনায় :

নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, পঞ্জাব

আহ্‌মদ চরিত

লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রা.)
ভাষান্তর	ঃ	আবু মোহাম্মদ হোসামউদ্দীন হায়দার
সংস্করণ	ঃ	২০২৪ (ভারত)
সম্পাদনায়	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	ঃ	৫০০
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত; সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব

Title	**:**	**Seerat Hazrat Masih Maud (as)**
Author	**:**	**Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (Ra)**
Translation	**:**	**Abu Mohammad Hoshamuddin Haydar**
1st Edition	**:**	**2024 (India)**
Edited by	**:**	**Bangla desk, India**
Copies	**:**	**500**
Published by	**:**	**Nazarat Nashr-o-Isha'at, Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab**
Printed at	**:**	**Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab**

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ অনুগ্রহে ভারতবর্ষে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ খুবই দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। একইসাথে নবাগত আহ্‌মদীরা জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস্ সালাম এর পবিত্র জীবনী এবং জামা'ত সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আগ্রহ পোষণ করে চলেছে। তাদের পিপাসা নিবারণের উদ্দেশ্যে সৈয়্যদনা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রচিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অন্যন্য সাধারণ জীবন চরিতকে প্রকাশ করা হচ্ছে যা শুধুমাত্র এই মহৎ উদ্দেশেই তিনি (রা.) রচনা করেছিলেন। '**সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)**' নামে এই পুস্তকটি হুযুর (রা.) ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে উর্দু ভাষায় প্রণয়ন করেছিলেন। পরবর্তীতে এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

পুস্তকটি সর্বপ্রথম ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে (বর্তমান বাংলাদেশে) বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়। অনুবাদ করেছিলেন জনাব আবু মোহাম্মদ হোসামউদ্দীন হায়দার সাহেব। '**আহ্‌মদ চরিত**' নামে পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ সাধু ভাষায় ইতিপূর্বে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস কোলকাতা থেকে তৎকালীন প্রাদেশিক আমির মরহুম মোহাম্মদ মাশরেক আলী সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল।

নব সংস্করণে পুস্তকটি কম্পোজ করেছেন বুশরা হামিদ সাহেবা। সাধু থেকে কতক চলিত ভাষায় রূপদান করেছেন জনাব রফিকুল ইসলাম এম এ (বাংলা) মুরব্বী সিলসিলাহ্ বাংলা ডেস্ক। প্রুফ রিডিং করেছেন সাজিদা খাতুন সাহেবা। মূল উর্দু পুস্তকটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রিভিউ এবং পরিমার্জন করেছেন জনাব রফিকুল ইসলাম এম এ (বাংলা) মুরব্বী সিলসিলাহ্ বাংলা ডেস্ক, জনাব আবু তাহের মন্ডল সদর রিভিউ কমিটি বাংলা, জনাব সেখ মোহাম্মদ আলী সেক্রেটারী এশায়াত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ

এবং জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, ভারত।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর সদয় অনুমোদনে পুস্তকটির পরিমার্জিত বাংলা সংস্করণ নব আঙ্গিকে প্রথমবার নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

আল্লাহ্তা'লা এই পুস্তকটি সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণময় করে তুলুন এবং তাদের জ্ঞানার্জনের পথে এটিকে সহায়ক করে তুলুন। আমিন।

বিনীত

অক্টোবর, ২০২৪ ইং

হাফিয মাখদুম শরীফ

নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

0707-ST002

Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad

Khalifatul Masih II

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহ্মদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)

লেখক পরিচিতি

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর দ্বিতীয় খলিফা হযরত আলহাজ্জ মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহ্মদ (রা.) ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম এবং জীবন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার স্বাক্ষর বহন করে। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে এই প্রতিশ্রুত সন্তানের বাহান্নটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ছিল। তাঁর রচিত কুরআন শরীফের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সম্বলিত 'তফসীরে সগীর' ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত 'তফসীরে কবীর' তাঁর অম্লান স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

তিনি ১৯৩৪ সালে তাহ্রীকে জাদীদ স্কীম আরম্ভ করে সমগ্র বিশ্বে আহ্মদীয়া মসজিদ ও ইসলাম প্রচার কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখেন। তিনি এই জামা'তের কয়েকটি অঙ্গ-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে জামা'তকে সাংগঠনিকভাবে অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও সুসংহত করেন। তাঁর খিলাফতকালে এই ঐশী জামা'ত বিশ্বের ৭৫টি দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় খলিফা তাঁর ৫২ বছর দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও কল্যাণময় খিলাফতকাল অতিবাহিত করে ৮ই নভেম্বর ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের রাবওয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

মুখবন্ধ (প্রথম সংস্করণ)

জামা'ত আহ্‌মদীয়ার দৈনন্দিন অগ্রগতি এবং এর বিশ্বব্যাপী প্রসারিত উন্নয়নের তরঙ্গ প্রত্যক্ষ করে যারা এর বিষয়ে অবগত নয় তাদের অন্তরে বিশদে জানার একপ্রকার আগ্রহ জাগরিত হয়। তবে বিভিন্ন অপারগতার কারণে যেহেতু পূর্ণাঙ্গ পুস্তকগুলির অধ্যয়ন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, সে উদ্দেশ্যে আমি একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনার মনস্থ করেছি যন্মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে এই জামা'ত এবং এর প্রতিষ্ঠাতার জীবনালেখ্য তুলে ধরব। যাতে সত্যানুরাগী পাঠকবৃন্দকে ঐশী অনুগ্রহের মাধ্যমে পুস্তিকাটি তাদের পথপ্রদর্শনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, সেইসাথে বিশদ গবেষণার প্রতি তাদের হৃদয়ে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। আর এভাবে যেন ঐশী ব্যবস্থাপনায় তাদের উত্তরণের পথও সুগম হয়ে ওঠে। সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকাটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তুলে ধরা হবে: আহ্‌মদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার জীবনী, তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী, প্রমাণাদিসহ তাঁর দাবি, ঐশী প্রচারে আগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ, ভবিষ্যদ্বাণী, কর্ম, এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের অবস্থা।

সূচীপত্র

(যে বিষয়গুলো এ পুস্তকে আলোচিত হয়েছে)

ক্রমিক নং	বিষয়স্তু	পৃ.
1	জন্ম	1
2	বংশ পরিচয়	1
3	ইতিহাসের আলোকে হযরত আকদস (আ.)	3
4	হযরত আকদস (আ.) 'র জন্ম ও বাল্যকাল	7
5	শৈশব হতে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ	9
6	শিক্ষাকাল	10
7	জীবনপথে চাকুরী গ্রহণ ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ	12
8	চাকুরী ত্যাগ	14
9	একটি মোকদ্দমায় ঐশী নিদর্শন	16
10	পরিশ্রমের অভ্যাস	17
11	ইলহামের সূচনা	18
12	পিতার মৃত্যু এবং প্রথম ঐশীবাণী	19
13	কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর (আ.) দৃঢ়তা	20
14	তপস্যা ও সাধনা	21
15	ইসলামের সেবা	22
16	ইলহামের প্রাচুর্য	23
17	বারাহীনে আহ্‌মদীয়া প্রণয়ন	23
18	অনবরত ইলহাম ও অদৃষ্টের সংবাদ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু	26
19	দ্বিতীয় বিবাহ ও সৃষ্টি সেবার প্রতি মনোনিবেশ, দাবির ঘোষণা	28
20	প্রচার জীবন প্রকাশ্য দীক্ষা দান	29
21	প্রতিশ্রুত মসীহ্ হবার দাবি ও ঘোষণা	29
22	আলেমগণের কঠোর বিরোধিতা এবং লুধিয়ানাতে ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ	30
23	দিল্লি মুবাহেলা	31
24	ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথমের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ	34
25	পবিত্র জুমআর দিন সরকারি ছুটি ঘোষণার জন্য প্রচেষ্টা	37
26	লাহোর সর্বধর্ম সম্মেলন	38
27	লেখরামের নিহত হবার ঘটনা	42

28	তুর্কী দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ	42
29	ডা. মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমা	43
30	সুলেহ খায়েরের প্রস্তাব	46
31	মুলতান গমন	46
32	পঞ্জাবে প্লেগের প্রাদূর্ভাব এবং হুযুর (আ.) এর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা	47
33	সিডিশন আইন	48
34	ধর্মীয় বিবাদ সম্পর্কিত মেমোরেন্ডাম	49
35	একটি মর্মঘাতী পুস্তক	51
36	জামা'তের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও বিরুদ্ধবাদীদের অসফলতা	52
37	লর্ড বিশপকে মীমাংসার আহ্বান	53
38	জামা'তের নামকরণ	53
39	আত্মীয়স্বজনের উৎপীড়ন	53
40	রিভিউ অব রিলিজিয়নস্	54
41	খোতবায়ে ইলহামিয়া	54
42	জামা'তে আরবি শিক্ষার উৎসাহ দান	55
43	মিনারের ভিত্তি স্থাপন	56
44	সাধনায় সফলতা, ঝিলাম যাত্রা	56
45	জামা'তের বিস্তার	57
46	শত্রুদের চক্রান্ত ও বৃটিশ বিচার	58
47	লাহোর যাত্রা	60
48	লেকচার শিয়ালকোট	62
49	মৌলবি আব্দুল করীম সাহেব (রা.) এর দেহাবসান এবং দিল্লি যাত্রা	64
50	মৃত্যুর ইলহাম এবং 'আল ওসিয়্যত'	67
51	সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠা	68
52	মোবারক আহ্‌মদের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী	68
53	আমেরিকার আগন্তুক	68
54	আর্য সমাজের ধর্মসভা	69
55	মুসলিম লীগ সম্বন্ধে হযরত সাহেবের মত	69
56	শেষ লাহোর যাত্রা	71
57	হুযুর (আ.) এর তিরোধান	73
58	হিন্দু মুসলমান মিলন প্রস্তাব	73

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلّی علیٰ رسولہ الکریم

আহ্‌মদ চরিত

জন্ম

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আ.) পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত গুরদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাটালা রেল স্টেশন হতে ১১ মাইল, অমৃতসর হতে ২৪ মাইল ও লাহোর হতে ৫৭ মাইল পূর্বদিকে কাদিয়ান গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে ১৮৩৬ অথবা ১৮৩৭ * খ্রিস্টাব্দে মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেবের ঘরে শুক্রবার দিন তিনি (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যমজ জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে একটি যমজ বোনেরও জন্ম হয়; জন্মের কিছুক্ষণ পরেই বোনের মৃত্যু হয়।

বংশ পরিচয়

তাঁর জীবনী আলোচনার পূর্বে তাঁর বংশপরিচয় উল্লেখ করা শ্রেয়ঃ বলে মনে হচ্ছে।

তাঁর বংশধর এ অঞ্চলে এক সম্মানীয় বংশধর বলে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর পূর্ব পুরুষ বর্‌লাস্ সম্রাট তৈমুরের পিতৃব্য ছিলেন। তৈমুর বরলাসের রাজ্য 'কিশ' করতলগত করলে বরলাস সপরিবারে খোরাসানে চলে যান। তাঁর বংশধরগণ বহুকাল যাবৎ খোরাসানে বসবাস করেন। হিজরী দশম শতাব্দী

* হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম. এ'র গবেষণা অনুযায়ী হযরত আকদস (আ.) ১৩'ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দ্রষ্টব্য

অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই বংশের মির্যা হাদি বেগ নামক এক ব্যক্তি কিছু অস্বাভাবিক কারণে স্বদেশ ত্যাগ করে দুইশত অনুচর সহ ভারতে আগমন করেন এবং বিয়াস অর্থাৎ বিপাসা নদীর নিকটবর্তীস্থানে বসতি স্থাপন করেন। বিয়াস নদীর তীর হতে ৯ মাইল দূরে একটি গ্রাম স্থাপন করেন, তার নাম রাখেন ইসলামপুর (অর্থাৎ ইসলামের শহর)। হাদি বেগ একজন উপযুক্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে কাজীর পদে নিযুক্ত করেন এবং সেই সময় হতে ইসলামপুর গ্রামটি 'ইসলামপুর কাজী' অর্থাৎ ইসলামপুর যেখানে কাজী বাস করেন নামে অভিহিত। কালক্রমে এই দীর্ঘ নাম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে 'কাজী' শব্দে পর্যবসিত হয় এবং 'কাজী' শব্দ পঞ্জাবী উচ্চারণে 'কাদি' রূপে উচ্চারিত হয়। সবশেষে এই নামও ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে কাদিয়ান নামে রূপান্তরিত হয়েছে।

যাইহোক, মির্যা হাদি বেগ সাহেব খোরাসান হতে বিয়াসের নিকটবর্তী এক গ্রামে বসবাস শুরু করেন এবং এখানেই তাঁর বংশধরগণ সর্বদা বসবাস করত। দিল্লির শাসন ব্যবস্থা হতে দূরে অবস্থানের সত্ত্বেও মোঘলদের রাজত্বকালে এই পরিবারের অনেকেই উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে সময় মোঘল গৌরব-রবি অস্তমিত হয় এবং পঞ্জাব প্রদেশে অরাজকতার সূচনা হয়, সেই সময় এই বংশ কাদিয়ান গ্রামের চতুর্দিকে প্রায় ৬০ বর্গ মাইল ব্যাপী একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু যখন শিখ জাতির অভ্যুত্থান হয় এবং রামগড়িয়া নামক শিখ সম্প্রদায় অন্যান্য কতিপয় গোষ্ঠির সঙ্গে মিলে এই পরিবারের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। যদিও তাঁর প্রপিতামহ নিজ সময়ে এক পর্যায় পর্যন্ত শত্রুদের হামলাকে স্তব্ধ রেখেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর (আ.) পিতামহের সময়কালে এই সাম্রাজ্য ক্রমশঃ হীনবল হওয়ায় এই বংশের অধিকৃত স্থান ক্রমাগত হস্তচ্যুত হয়ে পড়ে। অবশেষে কেবল কাদিয়ান গ্রাম ও তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী শস্য

প্রান্তর অবশিষ্ট থাকে। তখন কাদিয়ান একটি সুরক্ষিত দুর্গ সদৃশ ছিল। অবশেষে কিছু গ্রামের বাসিন্দাদের ষড়যন্ত্রে শিখেরা এই গ্রাম কবজা করে নেয় এবং এই পরিবারের সকল পুরুষ ও মহিলাকে বন্দি করে। কিন্তু কিছুকাল পরেই শিখেরা তাদেরকে এই এলাকা ছেড়ে অন্যত্রে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে। তাঁরা কপুরথলা স্থানান্তরিত হন এবং প্রায় ১৬ বছর এখানে অবস্থান করেন। এরপর মহারাজা রনজিৎ সিংহের শাসনকালে ছোট ছোট রাজন্যবর্গকে তিনি বশীভূত করে ফেলেন এবং এই ব্যবস্থায় মহারাজা রনজিৎ সিংহ পূর্ব জায়গীরের অনেকটা অংশ হযরত মির্যা সাহেবের পিতাকে ফেরত দেন। তিনি তাঁর ভাইদের সঙ্গে মহারাজার সৈনিক বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর যখন ইংরেজরা শিখ সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়, তখন মির্যা সাহেবের পিতার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু তাঁকে কাদিয়ানের ভূমি অধিকার স্বত্ব প্রদান করা হয়।

ইতিহাসের আলোকে আহ্‌মদ (আ.)

এস্থলে স্যার লেপেল গ্রেফিন্ সাহেবের "punjab chiefs" নামক গ্রন্থ হতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে আহ্‌মদ (আ.)'র সংক্ষিপ্ত বংশ বিবরণ পেশ করছি ঃ

'সম্রাট বাবরের রাজত্বের শেষ বছরে অর্থাৎ ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে হাদি বেগ নামক জনৈক সমরকন্দবাসী মোগল স্বদেশ পরিত্যাগ করে পঞ্জাবে আগমন করেন এবং গুরদাসপুর জেলায় বসতিস্থাপন করেন। তিনি শিক্ষিত ছিলেন এবং কাদিয়ানের চতুঃপার্শ্ববর্তী প্রায় ৭০ মাইল এলাকার কাজী অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। কথিত আছে, তিনি কাদিয়ান গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। এই গ্রামের নাম রাখেন ইসলামপুর কাজী; কিন্তু কালক্রমে ঐ নাম পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান কাদিয়ান* নামে রূপান্তরিত হয়েছে। কয়েক

* পঞ্জাবীরা 'য' কে 'দ' বলে। সেহেতু ইসলামপুর কাযিয়াঁর নাম কালক্রমে কাদিয়াঁ বা কাদিয়ান হয়ে যায় এবং এভাবে ইসলামপুর (শব্দটির) সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। (অনুলিখনকারী)

পুরুষ পর্যন্ত এই পরিবার বাদশাহের অধীনে সম্মানিত রাজকার্য্যে অধিষ্ঠিত থাকে। শিখদের আমলে তাঁরা হীনবল হয়ে পড়েন। এই বংশের গুল মুহাম্মদ ও তাঁর পুত্র আতা মুহাম্মদ রামগড়িয়া ও কানাইয়া মিসলো* কাদিয়ানসহ চতুঃপার্শ্ববর্তী এলাকা যাদের কবজায় ছিল সেই শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে অবিরত সংগ্রামে হীনবল হয়ে অবশেষে সমস্ত জায়গীর হারিয়ে বসেন এবং বেগোবালের সর্দার ফতেহ সিং আহ্‌লোওয়ালিয়ার শরণাপন্ন হন। এস্থানে ১২ বছর নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে কালাতিপাত করেন। অতঃপর ফতেহ সিংহের মৃত্যুর পর রনজিৎ সিংহ রামগড়িয়াদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের সমস্ত জায়গীর কেড়ে নেন এবং গোলাম মুর্তজাকে কাদিয়ানে পুনর্বহাল করেন ও তাঁর পিতৃপিতামহের জায়গীরের অধিকাংশ তাঁকে প্রত্যর্পণ করেন। গোলাম মুর্তাজা ও তাঁর ভাইয়েরা মহারাজার সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন এবং কাশ্মীরের সীমানায় ও অন্যান্য স্থানে যোগ্যতার সহিত অনেক রাজকার্য সমাধা করেন। নওনেহাল সিং, শের সিং ও লাহোর দরবারের সুবৃহৎ এলাকার নানা স্থানে গোলাম মুর্তজা সর্বদা যুদ্ধকার্যে নিয়োজিত থাকতেন। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি জেনারেল ভেনচুরার সহিত মান্ডি ও কল্লুর দিকে প্রেরিত হন এবং ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে একদল পদাতিক সৈন্যের অধিনায়ক রূপে পেশোয়ার প্রেরিত হন। হাজারার বিদ্রোহ দমনে গোলাম মুর্তজা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে যখন শিখ-দরবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে তখনও গোলাম মুর্তজা প্রভুর প্রতি স্বীয় কর্তব্য ভোলেন নি বরং তাঁর পক্ষেই যুদ্ধ করেন। এই সময় তাঁর ভাই গোলাম মহিউদ্দিনও দরবারের বিশেষ সহায়তা করেন। যখন ভাই মহারাজ সিং সৈন্য সহ দেওয়ান মূলরাজের সাহায্যার্থে মুলতানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন গোলাম মহিউদ্দিন, লঙ্গর খান সাহিওয়াল, সাহেব খান টোওয়ানা সহ ও অন্যান্য জায়গীরদারগণ

* এসব নাম আহ্‌লোওয়ালিয়া মিসল, রামগড়িয়া মিসল, কানাইয়া মিসল ইত্যাদি শিখদের কতিপয় গোষ্ঠির নাম।

মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করতে থাকেন এবং মিসর সাহেব দয়ালের সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি বিদ্রোহীদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করেন। শত্রুদের চেনাব নদী পার হওয়া ব্যাতীত অন্য কোন পালানোর পথ রইল না। ৬০০ জনের অধিক শত্রু পক্ষ এই নদীতে ডুবে মারা যায়।

ইংরেজ সংঘর্ষে দরবারের পক্ষে যুদ্ধ করার অপরাধে ইংরেজ রাজ এই বংশের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে এবং গোলাম মুর্তজা ও তাঁর ভাইদের জন্য ৭০০ টাকা পেনশন ধার্য্য করে; কেবল মাত্র কাদিয়ান ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি গ্রামে তাদের জমিদারী স্বত্ব রইল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় গোলাম মুর্তজা গভর্নমেন্টের সহায়তা করেন। তিনি অনেক লোককে ফৌজে ভর্তি করান। তাঁর পুত্র গোলাম কাদের জেনারেল নিকলসনের অধীনস্ত সেনাবাহিনীতে সেই সময় নিযুক্ত ছিলেন যখন উক্ত অফিসার ত্রিমু ঘাট নং ৪৬ শিয়ালকোট হতে পলায়নকারী ন্যাটো পদাতিক বাহিনীর বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন। জেনারেল নিকলসন গোলাম কাদেরকে তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে যে সনদ দিয়েছিলেন সেখানে লিখিত আছে,"১৮৫৭ সনে কাদিয়ানের পরিবার গুরদাসপুর জেলার অন্যান্য পরিবার হইতে অধিকতর অনুগত ছিল।"

গোলাম মুর্তজা একজন বিচক্ষণ হেকিম ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র গোলাম কাদের স্থলাভিষিক্ত হন। গোলাম কাদের স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যার্থে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অফিসারদের বহু সনদ তাঁর কাছে ছিল। গোলাম কাদের কিছুকাল গুরুদাসপুর জেলা দফতরের সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্রের স্বল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান আহ্‌মদকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করেন। গোলাম কাদেরের মৃত্যু অর্থাৎ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ হতে তাঁকে পরিবারের প্রধান বলে গণ্য করা হত। মির্যা সুলতান আহ্‌মদ উপ-তহসিলদার থেকে সরকারি চাকুরি করতে শুরু করেন এবং

বর্তমানে এক্সট্রা অ্যসিসট্যান্ট। তিনি কাদিয়ানের নম্বরদারও ছিলেন। নিজাম উদ্দিনের ভাই ইমাম উদ্দিন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। দিল্লী অবরোধ কালে তিনি হডসন অশ্বারোহী দলের অফিসার ছিলেন। তাঁর পিতা গোলাম মহিউদ্দিন তহসিলদার ছিলেন।

এখানে এও উল্লেখযোগ্য যে, গোলাম মুর্তজার কনিষ্ঠ পুত্র গোলাম আহ্‌মদ ইসলামের আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় নামক প্রসিদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়, তিনি খুব যত্নের সাথে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৯১ সনে নিজেকে ইসলাম ধর্মানুমোদিত মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ঘোষণা করেন। তিনি একজন শিক্ষিত ও ধর্মজ্ঞানী লোক হওয়াতে বহু সংখ্যক লোক তাঁর জামা'তভুক্ত হয়। বর্তমানে পঞ্জাব সহ ভারতের অন্যান্য ঐ জামা'তের সংখ্যা তিন লক্ষ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। মির্যা সাহেব আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রনয়ন করেন। তিনি জেহাদ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলির খণ্ডন করেন। মনে করা হয় এই সকল গ্রন্থ ইসলামের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু তাঁকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নানা বিপদ জালে জড়িত থাকতে হয়। কেননা, বিপক্ষ মতাবলম্বীগণের সঙ্গে অধিকাংশ সময় তাঁর ধর্ম তর্কযুদ্ধ ও মকদ্দমা চলত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর (১৯০৮ সনে) পূর্বে তিনি স্বীয় প্রভাব এতদূর বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তাঁর শত্রুগণও তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করে। কাদিয়ান এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল । এখানে আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার একটি বড় স্কুল খোলা হয়েছে। একটি ছাপাখানা স্থাপন করা হয়েছে, যদ্বারা সম্প্রদায় সম্পর্কিত খবরাদি সর্বত্র প্রচারিত হয়। প্রসিদ্ধ হেকিম মৌলবি নূরুদ্দীন মির্যা গোলাম আহ্‌মদের খলিফা পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। ইনি কিছুকাল কাশ্মীরের দরবারের রাজ চিকিৎসক ছিলেন।

এই পরিবারের মূল বাসস্থান কাদিয়ান মৌজাতে যা তাঁদের মালিকাধীন

এক বড় মৌজা এবং এর সংলগ্ন তিনটি মৌজার পাঁচ শতাংশ মালিক ছিল এই পরিবার।" *

হযরত আকদস (আ.)'র জন্ম ও বাল্যকাল

হযরত মির্যা সাহেবের সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয়ের পর তাঁর (আ.) জীবনী বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ১৮৩৬ অথবা ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে** আহ্‌মদ (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর পিতার অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। তিনি পূর্ব জায়গীরের কয়েকটি গ্রাম পুনঃপ্রাপ্ত হন এবং মহারাজা রনজিৎ সিংহের অধীনে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হয়ে খুব সম্ভ্রম লাভ করে ছিলেন। কিন্তু বোধ হয় খোদাতা'লার ইচ্ছা এই ছিল যে, বালক আহ্‌মদ এমনই ভাবে প্রতিপালিত হন যেন তাঁর মন বাল্যকাল হতেই আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁর জন্মের তিন বছর পরেই মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শিখ রাজ্যের অবনতি শুরু হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁর (আ.) পিতারও সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হতে থাকে। অবশেষে শিখরাজ্য পতনের পর তাঁর সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত হয়। সহস্র চেষ্টা এবং বহু সহস্র মূদ্রা ব্যায় করেও তিনি বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন নি। এই তীব্র নৈরাশ্যের বেদনা তাঁর জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত জাগরুক ছিল। হযরত মির্যা সাহেব তাঁর একটি পুস্তকে এ সম্বন্ধে লেখেনঃ-

"আমার পিতা তাঁর এই অকৃতকার্যতার ফলে সর্বদা বিষন্ন মনে কাল যাপন করতেন। এই কাজে তিনি প্রায় ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কারণ এই সকল গ্রাম এত দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের

* 'The Punjub Chiefs' ১'ম খণ্ড, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোর হতে প্রকাশিত।

** হযরত আকদস (আ.) এর জন্ম ১৩'ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ প্রমাণিত। (প্রকাশক)

হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল যে, সেগুলির পুনঃরুদ্ধারের আশা তাঁর একটা অমূলক কল্পনা মাত্র ছিল। তিনি মর্ম বেদনায় জর্জ্জরিত হয়ে বুকভরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে একটি মূর্ত্তিমান নৈরাশ্যের ন্যায় বিমর্ষভাবে দিন যাপন করতেন। তাঁর এই অবস্থা অবলোকন করে আমার অন্তরে এক বিশুদ্ধ নির্ম্মল পরিবর্তনের সুযোগ ঘটেছিল। কারণ আমার পিতার ব্যর্থ জীবনের চিত্র আমার চিত্তকে এক স্বর্গীয় জীবনের সন্ধান দিয়েছিল যেখানে পার্থিব বাসনার কণামাত্রও মিশ্রিত ছিল না। তিনি তখনও কয়েকটি গ্রামের মালিক ছিলেন এবং ইংরেজ সরকার হতে পেনশন পেতেন। তথাপি তিনি যা হারিয়েছিলেন তার তুলনায় অতি সামান্য বিবেচনায় তিনি সর্বদা দুঃখে ম্রিয়মান থাকতেন এবং বলতেন আমি এই নাপাক দুনিয়ার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি সেইরূপের অধ্যবসায় যদি ধর্মের জন্য করতাম, তাহলে আজ হয়ত আমি একজন ওলি কিংবা কুতুব হতাম। তিনি প্রায়ই নিম্ন লিখিত ফারসি পঙক্তিটি আবৃত্তি করতেন–

উমর বাগুযাশত্‌ ও নুমান্দ আসত্‌ জাযাইয়া মে চাঁন্দ,
বা কে দর ইয়াদ কসে সুবাহ কুনম শামে চাঁন্দ।

(অর্থাৎ 'জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; এখন সামান্যই বাকি আছে। যদি কয়েকটি রাত্রিও তাঁর চিন্তায় যাপন করতাম, ভাল হত।' অনুবাদক)

আমি তাঁকে বহুবার তাঁর স্বরচিত কবিতার পঙক্তি আবৃত্তি করতে শুনেছি। তা হল-

আয দরে তু অ্যায় কিসে হর বেকিসে,
নেসত্‌ উম্মিদম কে বরদম না উম্মিদ।

(হে নিঃসঙ্গ ব্যক্তি! তোমার উপত্যকা থেকে আমি আশা করি না যে, আমি জিতেছি; আমি হতাশ। অনুবাদক)

আবার কখনো কখনো ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর কবিতার পঙক্তি আবৃত্তি

করতেন-

বাআব দিদাহ্ উশ্‌শাক ও খাক পায়ে কিসে,
মুরাদে আসত্ কে দরখোঁ তপদ বাজায়ে কিসে।

আল্লাহ্‌তা'লার মহামহিমান্বিত বিচারাসনের সম্মুখে খালি হাতে উপস্থিত হতে হবে, এই তীব্র অনুশোচনা শেষকালে তাঁকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল। প্রায়শই দুঃখের সঙ্গে বলতেন, পৃথিবীর তুচ্ছ খড় কুটো আহরণের চেষ্টায় আমি আমার অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করেছি।"

শৈশব হতেই ইবাদতের প্রতি আগ্রহ

হযরত মির্যা সাহেব তাঁর পিতার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা হতে প্রতীয়মান হয় যে, খোদাতা'লা তাঁর বাল্য ও যৌবনকাল এমনভাবে গঠন করেছিলেন যে, সংসারের প্রতি আসক্তি কখনও তাঁর মনে জাগরিত হবার সুযোগ পায় নি। অবশ্য, তাঁর পিতা ও জেষ্ঠ্য ভ্রাতার সাংসারিক সম্মান ও প্রতিপত্তি তখনও নিতান্ত কম ছিল না; প্রশাসন তাঁদের সম্মান করত। তথাপি তাঁর পিতার জীবনব্যাপী নিষ্ফল চেষ্টা ও অধ্যবসায় এবং মর্মবেদনা তাঁর শুভ্র নির্মল অন্তঃকরণে যে শিক্ষা কায়েম করেছিল তা হল, দুনিয়া দুইদিনের, অনন্ত পরকাল খোদাতা'লার। বাল্যের এই শিক্ষা তিনি মর্মে মর্মে এমন গ্রহণ করেছিলেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত বিস্মৃত হন নি। যদিও দুনিয়া নানা প্রকার মোহনরূপে তাঁকে প্রলুব্ধ করত এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত করার চেষ্টা করত, তবুও তিনি কখনও সেদিকে দিক্‌পাত করেন নি। তিনি সংসার হতে এমন পৃথক হয়েছিলেন যে, এই জীবনে আর পুনর্মিলন হয় নি।

পিতার পার্থিব চেষ্টায় ব্যর্থ জীবনের যে করুণ ছবিটি বাল্যকালেই তাঁর স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়েছিল, তা কখনও মুছে যায়নি। তাঁর মনে সাংসারিক বাসনা কখনও উদিত হয়নি এবং অতি অল্প বয়সেই তাঁর মনে খোদাতা'লার

প্রিয় কাজ কীভাবে সাধন করতে পারেন, এই ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবনী লেখক শেখ ইয়াকুব আলী (রাঃ) তাঁর বাল্য জীবন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

"যখন তাঁর বয়স নিতান্ত অল্প ছিল তখন তিনি তাঁর সমবয়স্ক একটি বালিকাকে (যার সঙ্গে পরে তাঁর বিবাহ হয়েছিল) বলতেন–"আমার জন্য দোয়া কর, যেন আমার নামায পড়ার সৌভাগ্য হয়।"

এই ক্ষুদ্র ঘটনা হতেই বোঝা যায় যে, শৈশবেই তিনি তাঁর সমস্ত বাসনা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কীরূপ ঐকান্তিকভাবে খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি কিরূপ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন তারও কতকটা আভাস এই ঘটনা হতে পাওয়া যায়। কারণ এত অল্প বয়সেই তিনি সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির মূল যে একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লা তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, আল্লাহ্‌তা'লার ইবাদত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বলেই সম্পন্ন হয় এবং নামায পড়ার বাসনা কেবল তিনিই চরিতার্থ করতে পারেন। যখন আমরা দেখতে পাই যে, যে গৃহে তিনি লালিত ও পালিত হচ্ছিলেন, সে গৃহের ছোট বড় সকলেই যেন কেবল দুনিয়াকেই তাদের খোদা রূপে বরণ করেছিল; সেই গৃহে এমন ঘোর বৈষয়িক লোকেদের সঙ্গে থেকেও যাঁর চিত্ত যখন খোদাপ্রেমে এতদূর আপ্লুত ছিল –তখন আমাদের স্বতঃই মনে হয় খোদাতা'লা স্বয়ং এই বালকের চিত্তকে এতটা পবিত্র, নির্ম্মল ও উন্নত করেছিলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এই বালকের দ্বারা পৃথিবীর যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হবে- তারই জন্য তাকে প্রস্তুত করছিলেন।

শিক্ষা কাল

অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন যুগে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। লেখাপড়ার চর্চা বড় একটা ছিলনা। শিখ যুগ সম্পর্কে কথিত আছে, যদি কখনও

কোন ব্যক্তির নামে তার কোন বন্ধুর চিঠি আসত, তা পড়ার জন্য বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। অনেক সময় বহুদিন পর্যন্ত চিঠিটি অপঠিত রয়ে যেত। বহু প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা অশিক্ষিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা মির্যা সাহেবের দ্বারা ইসলামের অনেক খেদমত নেবেন বলেই বোধ হয় তাঁর পিতার অন্তঃকরণে পুত্রকে সুশিক্ষা দেবার বাসনা বলবতী হয়ে ওঠে। নিজে নানা রকম সাংসারিক কাজকর্মে জড়িত ও ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও পুত্রকে তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা উপযুক্তরূপে দান করতে তিনি বিমুখ হন নি।

তিনি যখন ছোট ছিলেন তাঁর পিতা তাঁর লেখাপড়ার জন্য ফজলে এলাহি নামে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তাঁর নিকট মির্যা সাহেব কুরআন শরীফ ও কয়েকটি ফার্সী কেতাব পাঠ করেন। অতঃপর ১০ বছর বয়সকালে ফজল আহ্‌মদ নামক অন্য একজন শিক্ষক রাখা হয়। ইনি অত্যন্ত সাদাসিধে ও ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। মির্যা সাহেব নিজেই বলেছিলেন, এই শিক্ষক তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদান করতেন। এই শিক্ষকের নিকট তিনি কয়েকটি প্রাথমিক আরবি ব্যাকরণ পুস্তক পাঠ করেন।

অতঃপর ১৭/১৮ বছর বয়সে মৌলবি গুল আলী শাহ্‌ সাহেবের নিকট আরবি ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শাস্ত্রের কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করেন। যশস্বী চিকিৎসক তাঁর পিতার নিকট হতে চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছু পুস্তক পাঠ করেন। সে সময় শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, তার তুলনায় মির্যা সাহেব বেশ ভাল শিক্ষা পেয়েছিলেন বলা যেতে পারে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তার বিচারে সেই শিক্ষা অতি সামান্য মনে হয়। যে শিক্ষকগণ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁরাও সাধারণ রকমের লেখাপড়া জানতেন। তখন শিক্ষার প্রচলন এতই সামান্য ছিল যে, ২/১ খানা আরবি ও ফারসি কেতাব পড়লেই লোকের কাছে মস্ত বড় আলেম বলে পরিগণিত হত। কিন্তু পরবর্তী কালে যে মহান কাজে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে নিয়োগ

করেছিলেন সে তদুপযোগী শিক্ষা তিনি তাঁর পিতার দ্বারা নিয়োগকৃত শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করতে পারেন নি। তবে এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে, তিনি এতটুকু শিক্ষা নিশ্চয়ই লাভ করেছিলেন যদ্বারা আরবি ও ফারসি ভাষা বুঝতে পারতেন। আরবি ভাষায় যৎসামান্য এবং ফারসিতে তিনি বেশ ভালরূপে কথাবার্তা বলতে পারতেন। এর চাইতে বেশী শিক্ষা লাভ তাঁর হয় নি। রীতিমত ধর্ম শিক্ষা তিনি কোন শিক্ষকের নিকট হতে পান নি; কিন্তু এটি সত্য যে, তিনি পড়াশুনা করতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর পিতার যে লাইব্রেরী ছিল সেখানে তিনি নানাবিধ পুস্তক পাঠে দিবা-রাত্র অতিবাহিত করতেন। এই কাজে তিনি এত তন্ময় হয়ে পড়তেন যে, পাছে তাঁর স্বাস্থ্য হানি হয়, কতকটা এই ভয়ে এবং কতকটা সংসারের কাজে তাঁর সহায়তা লাভের আশায় পিতা তাঁকে অনেক সময় বাধা প্রদান করতেন।

চাকুরী গ্রহণ ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ

যখন মির্যা সাহেবের শিক্ষাকাল সমাপ্ত হয়, সেই সময়ে পঞ্জাবে ইংরেজ শাসন দৃঢ়মূল হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের শোচনীয় ঘটনাবলীর অবসান হয়েছিল। ভারতীয়রা তখন ইংরেজ রাজ্যের অধীনে চাকুরীবৃত্তি গ্রহণ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল। বিভিন্ন অভিজাত বংশীয় তরুণগণ রাজসরকারে চাকুরী গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে বিশেষতঃ জমিদারী কাজে তাঁর অনুরাগের অভাব দেখে মির্যা সাহেবের পিতা তাঁকে চাকুরীতে নিয়োজিত করার অভিপ্রায়ে শিয়ালকোট নিয়ে যান। সেখানে তিনি ডেপুটি কমিশনারের অফিসে নিযুক্ত হন। অধিকাংশ সময় তিনি জ্ঞানচর্চায় রত থাকতেন। তিনি অবসর সময়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন অথবা বিদ্যার্থীগণকে শিক্ষা দান করতেন অথবা ধর্মীয় তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন।। যদিও তিনি সেই সময়ে ২৮ বছরের যুবক পুরুষ ছিলেন, তথাপি এতটাই ধর্মভীরু ছিলেন যে অনেক বয়োবৃদ্ধ হিন্দু

মুসলমানও তাঁকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি স্বভাবতঃ অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাতভাবে ধর্মকর্মে দিন কাটাতে ভালবাসতেন। ঘর হতে বড় একটা বাইরে বের হতেন না।

খ্রিস্টান মিশনারীগণ সেই সময়ে পঞ্জাবে সবে নূতন আস্তানা গেঁড়েছে। মুসলমানরা তাদের হামলা সম্পর্কে অবগত ছিলনা। তারা প্রায়ই পাদ্রীদের সঙ্গে তর্কে পেরে উঠত না। কিন্তু মির্যা সাহেবের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ হলেই পাদ্রীগণকে সর্বদাই তাঁর নিকট হার মানতে হত। এজন্য পাদ্রীদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন, তাঁরা শত মতভেদ সত্ত্বেও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

তাঁর এক জীবন চরিতকার লিখেছেন যে, রেভারেন্ড বাটলার এম.এ. শিয়ালকোটের মিশনে কাজ করতেন। তাঁর সঙ্গে হযরত মির্যা সাহেবের অনেক সময় তর্ক-বিতর্ক হত। তাঁর বিলাত প্রত্যাগমন করার সময় হযরত মির্যা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর অফিসে উপস্থিত হন। ডেপুটী কমিশনার সাহেব তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'মির্যা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' অতঃপর তিনি সোজা যে দপ্তরে মির্যা সাহেব কাজ করছিলেন সেই দপ্তরে প্রবেশ করেন এবং কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর বিদায় গ্রহণ করেন।

এই ঘটনা সেই সময়ের কথা যখন মিশনারীগণ ইংরেজ গভর্ণমেন্টের নিত্য নূতন দেশ বিজয়কে খ্রিস্টান ধর্মের মাহাত্ম্য বলে ঘোষণা করতেন। পাদ্রীগণ গর্বে এতদূর স্ফীত হয়েছিল যে, তৎকালীন তাদের লিখিত ইসলাম বিরোধী পুস্তকাদি পাঠে জানা যায় যে, হয়তো তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, গভর্ণমেন্ট অচিরেই তরবারি বলে সমস্ত জাতিকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করবে। মিশনারীগণ ইসলাম ধর্মের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার উপর নানা প্রকার অশিষ্ট ও অবমাননাকর ভাষা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে। এরূপ লেখনী দেখে কোন কোন ইউরোপীয়ান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তি

মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে, হিন্দুস্তানে দ্বিতীয় বার ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ন্যায় বিদ্রোহ আরম্ভ হলে তাঁরা আশ্চার্যান্বিত হবেন না। এরূপ অবস্থা ততদিন বহাল ছিল যতদিন খ্রিস্টান পাদ্রীগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা ইংরেজদের হাতে ন্যস্ত; পাদ্রীদের হাতে নয় এবং মহারানী ভিক্টোরিয়া কখনও বল প্রয়োগে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পক্ষপাতী হতে পারেন না, অথবা কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকের মনে অন্যায় পীড়া দেওয়া তাঁর অভিপ্রায় নয়।

মোটকথা, সেই সময় খ্রিস্টান ও মুসলমানগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তা মোটেই প্রীতিকর ছিলনা। যাঁরা তাদের কথা বিনা প্রতিবাদে শ্রবণ করতেন পাদ্রীগণের শিষ্টাচার কেবল এই শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর যাঁরা তাদের বাক্যের প্রতিবাদ করতেন, পাদ্রীগণ তাঁদের উপর অগ্নিশর্মা হয়ে যেতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও মির্যা সাহেব ধর্মীয় নিন্দা কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না এবং নির্ভীক চিত্তে সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর মত প্রকাশ করতেন। রেভারেন্ড বাটলার সাহেব তাঁর সরলতা ও ধর্ম পরায়নতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে খুব সম্মান করতেন। যদিও তিনি জানতেন যে, মির্যা সাহেবের মত লোককে কখনই তাঁদের দলভুক্ত করাতে পারবেন না; হয়তো তিনি তাঁর দলভুক্ত হয়ে যেতে পারেন। একজন শিকারীর অন্য শিকারীর প্রতি বিদ্যমান সহজাত ঘৃণা সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মীয় তার্কিকের তুলনায় মির্যা সাহেবের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং দেশে ফেরার সময় সাক্ষাতের জন্য তাঁর দপ্তরে আগমন করেছিলেন এবং সাক্ষাত ব্যাতিরেকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে তিনি রাজি হন নি।

চাকুরী ত্যাগ

প্রায় চার বছর মির্যা সাহেব শিয়ালকোটে চাকুরি করেন, কিন্তু এ কাজে তিনি নিতান্ত বীতস্পৃহ ছিলেন। পিতার আদেশ পাওয়া মাত্রই তিনি কাজ

ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসেন এবং পিতার আদেশানুযায়ী জমিদারী মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশোনা করতে থাকেন। এ কাজেও তাঁর মন লাগল না, কিন্তু অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন বলে পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারলেন না। জমিদারী পরিচালন কাজে তাঁর একটুও অনুরাগ প্রকাশ পেল না। তখন যারা তাঁর আচরণ দেখেছেন তাঁরা বলেন, অনেক সময় মোকদ্দমায় হেরে তিনি প্রফুল্ল মুখে বাড়ি ফিরতেন। তাঁর আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, 'আমার যতদূর সাধ্য করেছি, আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় যা ছিল, তাই হয়েছে। মোকদ্দমা শেষ হয়েছে, এখন নির্বিঘ্নে আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন থাকতে পারব।' এই সময়টা মির্যা সাহেবের একটা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সময় ছিল। তাঁর পিতার ঐকান্তিক বাসনা, তিনি জমিদারী কাজকর্ম দেখাশোনা করেন অথবা সরকারী কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু উভয় কাজের উপরেই মির্যা সাহেবের দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। এ জন্য তাঁকে মাঝে মাঝে পিতার ভৎর্সনা সহ্য করতে হত। যতদিন তাঁর মাতা জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি পুত্রকে সকলের নিন্দা হতে রক্ষা করতেন। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর, পিতা ও বড় ভাইয়ের তিরস্কার তাঁকে সহ্য করতে হত। তাঁরা ভাবতেন যে, আহ্‌মদের অলস স্বভাবই তাঁর সংসারের প্রতি অবহেলার প্রধান কারণ। তাঁর পিতা দুঃখ করে বলতেন, আমার মৃত্যুর পর এর কি উপায়ে দিন কাটবে? হয়ত বড় ভাইয়ের গলগ্রহ হয়ে থাকবে। তখনও তিনি পুত্রকে অনুক্ষণ অধ্যয়ণে রত দেখে 'মোল্লা' বলে ঠাট্টা করতেন এবং বলতেন আমার বংশে এই মোল্লার উদ্ভব কীভাবে হল। কিন্তু তথাপি, পিতা তাঁর ধর্ম-কর্মের আসক্তি সর্বদা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন না। অনেক সময় যখন তিনি সংসারে নিজের বিফলতার কথাগুলি স্মরণ করতেন, তখন আহ্‌মদের ধর্ম নিষ্ঠার প্রশংসা করে বলতেন, আসল কাজ আমার এই পুত্রই করছে। অনেক সময় মির্যা সাহেব পিতার চোখ-রাঙ্গানি উপেক্ষা করে তাঁকে কুরআন-হাদিস শোনাতেন। সে কি আশ্চর্য দৃশ্য! পিতা চাইতেন কী উপায়ে পুত্রকে সংসারের প্রতি অনুরক্ত করা যায়, পক্ষান্তরে পুত্র চেষ্টা

করতেন কী করলে পিতার মনে ধর্ম ভাব জাগরিত হয় এবং সংসারের বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র প্রেমে মত্ত হন। এই অদ্ভুত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা কোন কলমের কাজ নয়, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী হৃদয়মাঝে এর নকশা অঙ্কন করতে পারেন। এই সময় কপুরথলা রাজার দপ্তরে শিক্ষা বিভাগের একটি পদে তাঁকে নিয়োগ করা স্থির হয়। কিন্তু তিনি উক্ত কর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এর ফলে তাঁর পিতা অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হন। পিতার মনোক্লেশ দেখে হযরত আহ্‌মদ মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, যতকাল পিতা জীবিত থাকবেন, সাধ্যমত বৈষয়িক কার্যে তাঁর সহায়তা করবেন এবং তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি যাতে আরামে কাটে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এর পর থেকে সংসারের প্রতি তাঁর মন পূর্ববৎ বিমুখ থাকলেও তিনি পিতার কাজে সর্বদা রত থাকতেন। কিন্তু জয়-পরাজয়ের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না।

একটি মোকদ্দমায় ঐশী নিদর্শন

যদিও হযরত আহ্‌মদ (আ.) এই সময়ে পিতার সাহায্যকল্পে নানা বিষয়ক কাজে লিপ্ত থাকতেন তথাপি তাঁর মনের গতি এক বিপরীত দিকে ধাবিত ছিল। যেমন কথায় বলে–"দাস্ত দরকার দিল বা ইয়ার" অর্থাৎ 'হাতে কাজ কিন্তু মন বন্ধুর পানে'। যখনই মামলা-মোকদ্দমা হতে সামান্য অবসর পেতেন তখনই তিনি আল্লাহ্‌র ধ্যানে মনোনিবেশ করতেন। তাঁকে অনবরত মোকদ্দমা উপলক্ষে শহরে যাতায়াত করতে হলেও কখনো নামাযে ব্যতিক্রম হত না। এমন কি মোকদ্দমা শুনানীর সময়েও নামাযে ত্রুটি হত না। একদিন কোন এক গুরুতর মামলায় তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ঐ মোকদ্দমার ফলাফলের উপর তাঁর ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান অনেকটা নির্ভর করছিল। যখন তিনি আদালতে উপস্থিত হন ঠিক সেই সময়ে বিচারক অন্য একটা দরকারী মোকদ্দমা হাতে নিয়েছিলেন। সেজন্য অনেক বিলম্ব হয়। যখন তিনি লক্ষ্য করেন, ম্যাজিস্ট্রেট তো এই বিচার নিয়ে ব্যস্ত

আর এদিকে নামাযের সময় প্রায় পার হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি নিজের মোকদ্দমার ভার আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিয়ে নিকটবর্তী গাছের ছায়াতলে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান। এমন সময় আদালত হতে ডাক আসে। কিন্তু তিনি নির্বিকার চিত্তে প্রফুল্ল মনে নামায পড়তে লাগলেন। যখন নামায পড়া শেষ হল, তখন তিনি ভাবলেন যে নিশ্চয়ই মোকদ্দমা বিবাদী পক্ষে একতরফা ডিক্রী হয়ে গিয়েছে। অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে, তাঁর পক্ষেই ডিক্রী হয়েছে। বিচারক একজন ইংরেজ ছিলেন। তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতেই প্রমাণাদি পরীক্ষা করে তাঁর পক্ষেই রায় দিয়েছেন। এভাবেই খোদাতা'লা তাঁর ওকালতি করেন।

মোটকথা, তিনি সাংসারিক কার্যে এমন নিযুক্ত ছিলেন যেমন কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ করানো হয় কিন্তু সে কাজ করতে সে রাজি নয়। যদিও সেই কাজ তাঁরই ভালোর জন্য। কারণ, তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা হওয়া মানে তাঁর নিজের সম্পত্তি রক্ষা হওয়া। কেননা, তিনি তাঁর উত্তরসূরী। সুতরাং বুদ্ধি ও বিবেক থাকা সত্ত্বেও এই কর্মে বিমুখ হওয়ার অর্থ হল, তিনি সম্পূর্ণ সংসার বিমুখ ছিলেন এবং তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল খোদার নৈকট্য অর্জন।

পরিশ্রমের অভ্যাস

দুনিয়ার প্রতি আহ্‌মদের মন বিমুখ ছিল। নির্জনতাকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসতেন। কিন্তু তাই বলে তিনি কখনও অলস বা শ্রম বিমুখ ছিলেন না। বস্তুতঃ তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। যখন তিনি দূরে কোথাও যেতেন তাঁর ঘোড়াসহ সেবককে আগে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি পরে হেঁটে যেতেন। ২০/২৫ মাইল হেঁটে গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হতেন। প্রায়ই তিনি দূর দূরান্তের পথ হেঁটে অতিক্রম করতেন। ঘোড়ায় চেপে কদাচিৎ যেতেন। তাঁর এই ভ্রমণ করার অভ্যাস শেষ জীবন পর্যন্ত ছিল। যখন তাঁর বয়স

সত্তরের অধিক এবং কতিপয় কঠিন রোগে আক্রান্ত, তখনও তিনি প্রায় প্রতিদিন খোলা হাওয়ায় ভ্রমণে বের হতেন এবং ৪/৫ মাইল পথ বেড়িয়ে আসতেন। বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বের দিনের কথা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ফজরের নামাযের পূর্বে (নামাযের সময় সূর্য উদয়ের সোয়া ঘন্টা পূর্বের হয়ে থাকে) তিনি ভ্রমণে বের হতেন এবং ডাল্লা পর্যন্ত (যা কাদিয়ান হতে বাটালার পথে প্রায় সাড়ে ৫ মাইল দূরের এক গ্রাম) পৌঁছনোর পর নামাযের সময় হত।

ইলহামের সূচনা

যখন তাঁর বয়স প্রায় ৪০ বছর সেই সময়ে ১৮৭৬ সনে তাঁর পিতা একবার পীড়িত হন। যদিও তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ছিল তথাপি আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আহ্‌মদকে এই সংবাদ দেন- وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ (তাযকারাহ্‌ পৃ ২৪, চতুর্থ সংস্করণ) অর্থাৎ,"রাতে আগমনকারীর শপথ, তুমি কি জান রাতে কি আসবে?" এই ইলহামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে এই জ্ঞানের উদয় হল যে, এ হতে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হচ্ছে, যা সন্ধ্যার সময় সংঘটিত হবে। এই ঘটনার পূর্বে তিনি অনেক দিন হতে নানা প্রকার সত্য স্বপ্ন দর্শন করছিলেন, যার অন্তর্ভুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনেক হিন্দু ও শিখ ভদ্রলোক স্বচক্ষে পূর্ণ হতে দেখেছিলেন। কিন্তু এবার সর্ব প্রথম আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর প্রতি ইলহাম (বাণী) প্রেরণ করেন যেখানে অতীব স্নেহের সঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে অবগত করেন, তোমার জাগতিক পিতার অবসান হতে চলেছে এবং আজ হতেই আমি তোমার ঐশী পিতা। যাইহোক তাঁর উপর হওয়া প্রথম ইলহামে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর পিতার আসন্ন মৃত্যু সংবাদ প্রদান করেন। এই সংবাদে তাঁর মনে অত্যন্ত শোকের সঞ্চার হয়; পিতার মৃত্যুর পর কিরূপে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হবে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও এই ভাবনা তাঁর মনে উদিত হয়। তখনই খোদাতা'লার দ্বিতীয় ইলহাম তাঁর এই বিপদকালে তাঁর মনে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা প্রদান

করে। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ নিজ অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর ভাষায় উল্লেখ করা যথোচিত হবে বলে মনে করি। তিনি (আ.) বলেন,

পিতার মৃত্যু এবং প্রথম ঐশীবাণী

"যখন আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে অবগত করেন যে, সূর্যাস্তের পরেই আমার পিতার মৃত্যু হবে, তখন মানব স্বভাব সুলভ দুর্বলতাবশতঃ আমার মনে গভীর দুঃখের সঞ্চার হল। তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের সাংসারিক আয় বহুল পরিমাণে সংশ্লিষ্ট ছিল। তিনি ইংরেজ গভর্ণমেন্টের নিকট হতে পেন্‌শন ও অন্য প্রকারের পুরস্কারাদি পেতেন। এই সকলের মেয়াদ তাঁর জীবনকাল পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং আমার মনে এই ভাবনা ও ভয়ের উদয় হল যে, হয়ত এরপর আমার দুঃখের দিন আরম্ভ হবে। এই ভাবনাটি বিদ্যুৎবেগে আমার মনের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য এসেছিল মাত্র, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দ্বিতীয় ইলহাম হয়-اليس الله بكافٍ عبدهٗ "আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার (প্রতিপালনের) জন্য যথেষ্ট নন।" উপরোক্ত ইলহাম আমার মনে এমনি শান্তি দান করেছিল, যেমন গভীর ক্ষতের উপর প্রলেপ লাগালে মুহূর্তের মধ্যে তা ঠিক হয়ে যায়। এই ইলহামের পর আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মাল যে, খোদা আমাকে নিশ্চয়ই অসহায়ভাবে পরিত্যাগ করবেন না। আমি তখনই কাগজের উপর এই ইলহাম লিখে কাদিয়ান নিবাসী মলাওয়ামাল নামক জনৈক ক্ষত্রিয় যিনি এখনও জীবিত আছেন (তিনি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে মারা যান- সম্পাদক) তাঁকে অমৃতসর প্রেরণ করি এবং হেকিম মোহাম্মাদ শরীফ কালানূরীর হাতে একটি আংটীর মোহরের উপর এই বাণী খোদাই করিয়ে আনতে অনুরোধ করি। আমি এই হিন্দু ভদ্রলোককে কেবল এই উদ্দেশ্যে এই কাজে নিযুক্ত করি যেন তিনি পরবর্তীকালে এই ভবিষ্যদ্বাণীর একজন নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসাবে

বিদ্যমান থাকেন। এই আংটী প্রস্তুত করতে পাঁচ টাকা লেগেছিল। সেটি এখন ও আমার নিকট মজুদ আছে। যার চিহ্ন এইরূপ”

(হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড ২২, পৃ. ২১৯-২২০)

মোট কথা, যে দিন সন্ধ্যার সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়, তার কয়েক ঘন্টা পূর্বেই তিনি এই ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর খোদাতা’লা তাঁকে আশ্বাসবাণী দ্বারা সান্তনা দেন– “হে আহ্‌মদ, তুমি ভয় কর না। আল্লাহ্‌তা’লা স্বয়ং তোমার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।” সন্ধ্যার সময় পিতা ইহধাম পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁর জীবনের এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা হল।

কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর (আ.) দৃঢ়তা

হযরত মির্যা সাহেবের পিতার বাটালা, অমৃতসর ও গুরদাসপুরে কয়েকটি বাড়ি-ঘর ও দোকান পাট ছিল এবং কিছু সম্পত্তি কাদিয়ানেও ছিল। তাঁরা দুই সহোদর ধর্মের বিধান ও রাজকীয় আইনের বিধি অনুসারে এই সম্পত্তির সমান ভাগে উত্তরাধিকারী হলেন। তাঁর নিজ অংশের সম্পত্তির আয় হতে তিনি সহজে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর ভাই হতে পৃথক না হয়ে, তাঁরই পরিবারভুক্ত হয়ে রইলেন। বড়ো ভাই তাঁকে যা কিছু দিতেন, তাই তিনি সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করতেন। এভাবে বড়ো ভাই তাঁর পিতৃস্থান অধিকার করলেন। কিন্তু তাঁর ভাই গুরদাসপুরে চাকুরী করার কারণে তিনি সেইখানেই বাস করতেন। এখানে হযরত মির্যা সাহেবকে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করতে হত। এমন কি জীবন ধারণের অত্যাবশ্যক জিনিসগুলিও তাঁকে অতি কষ্টে সংগ্রহ করতে হত। বড়ো ভাইয়ের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে এরূপ কষ্টে কালযাপন করতে হয়েছিল। এই সময়কে তাঁর এক কঠোর পরীক্ষা-কাল বলা যেতে পারে। তিনি যেরূপে অবিচল সহিষ্ণুতার সঙ্গে নিজ কাজ সম্পাদন করতেন, সেটি তাঁর গৌরবময়

ভবিষ্যৎ জীবনের নিদর্শন মাত্র। তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে পৈত্রিক সম্পত্তির সমতুল্য অংশের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বড়ো ভাই হাত তুলে যা দিতেন তিনি তাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতেন। শুধু আহার্য ও পরিধানের উপযোগী বস্তু পেলেই তিনি আর কিছুই চাইতেন না। তাঁর ভাই তাঁর এই সকল মোটামুটি অভাব পূরণে নিজ অভিরুচি অনুসারে চেষ্টা করতেন এবং তাঁকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন এবং কতক সম্ভ্রমও করতেন। কিন্তু ঘোর সংসারী বড়ো ভাই কনিষ্ঠের এই বৈরাগ্যের ভাব ক্ষমার চোখে দেখতে পারতেন না। এটি তাঁর অলস প্রকৃতির ফল বলে মনে করতেন। কখনও কখনও তিনি আফসোস প্রকাশ করে বলতেন যে, তুমি কোন কাজের জন্য কেন দিক্‌পাত করো না? একদিন হযরত মির্যা সাহেব একটি সংবাদপত্র আনার জন্য তার মূল্য চেয়ে পাঠালে তাঁর ভাই এই সামান্য খরচ দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, তিনি এইরূপ বাহুল্য ব্যয়ের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। বড়ো ভাই কনিষ্ঠের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেও এই যৎসামান্য ব্যয় বহনে অস্বীকার করেন। তিনি বলতেন,আহ্‌মদ কাজের তো কিছুই করে না, শুধু ঘরে বসে পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠে সময় অতিবাহিত করে। এই ঘটনা হতে স্পষ্ট বোঝা যায় হযরত মির্যা সাহেবের ভাই কত বেশী সংসারী ছিলেন। ছোট ভাই-এর কাছে এই জিনিসগুলি যে কত প্রয়োজনীয় তা তিনি বুঝতেন না এবং তা পূরণের প্রতি যথেষ্ট মানোযোগও দিতেন না। অধিকন্তু আরও দুঃখের কারণ এই ছিল যে, বড়ো ভাই কর্মপোলক্ষে অধিকাংশ সময় কাদিয়ানের বাইরে থাকতেন এবং তাঁর কর্মচারীগণ এই সুযোগে হযরত মির্যা সাহেবকে নানা প্রকারে মনোপীড়া দিতে কুণ্ঠিত বোধ করত না।

তপস্যা ও সাধনা

এই সময়ে আহ্‌মদের প্রতি আদেশ হয় যে, আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ লাভের জন্য চিত্তশুদ্ধির কঠোর সাধনা আবশ্যক। এজন্য তাঁকে রোযা রাখতে

হবে। এই আদেশবাণী অনুসারে তিনি ক্রমাগত ৬ মাস রোযা রাখেন। অনেক সময় এরূপ হত যে, যখন তাঁর জন্য ঘর হতে আহার্য পাঠানো হত তা দরিদ্র দুঃখীগণকে বিতরণ করে দিতেন। তিনি রোযা খুলে খাবার চেয়ে পাঠালে অনেক সময় তাঁকে স্পষ্ট মানা করা হত। তখন তিনি শুধু জলপান করে অথবা অন্য কিছু মুখে দিয়ে আহারের কাজ সমাপ্ত করতেন এবং পুনরায় সকাল থেকে রোযা রাখতেন। এই সময়টা তাঁর পক্ষে এক কঠোর সাধনার সময় ছিল এবং তিনি অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর কষ্টের সীমা ছিল না, তবুও তিনি কোনও কালে মুখ ফুটে অথবা আকারে ইঙ্গিতেও পৈতৃক সম্পত্তির অংশের দাবি করতেন না।

যে সময়ে তিনি রোযা রাখতেন কেবল সেই সময়ই নয় বরং এটি তার প্রকৃতিগত অভ্যাস ছিল যে, সর্বদাই তিনি তাঁর খাদ্য সামগ্রী দীন দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। অনেক সময় এইরূপ দান করার ফলে তাঁর কাছে একটি রুটির বেশী থাকত না, যা ওজনে এক ছটাকের বেশী হত না এবং তিনি সেই রুটি দিয়েই আহারের কাজ সমাধা করতেন। কোন কোন সময় তিনি শুধু এক মুঠো ছোলা দিয়েই ক্ষুধা নিবারন করতেন এবং তাঁর আহার্য আসলে গরীবদের মধ্যে বিতরন করে দিতেন। ফলে কয়েকটি দীন দুঃখী সর্বদাই তাঁর নিকট থাকত। দুই ভাইয়ের মজলিস দুইরকম ছিল। জ্যেষ্ঠের মজলিসে সর্বদা বিত্তশালীরা উপস্থিত থাকত এবং কনিষ্ঠের মজলিসে থাকত একদল নিঃসম্বল নিরুপায় কাঙ্গাল মানুষ। নিজে না খেয়ে তিনি তাদেরকে খাওয়াতেন এবং নিজের জীবন থেকে তাদের জীবন বেশী মূল্যবান জ্ঞান করতেন।

ইসলামের সেবা

এই সময় হতে হযরত আহ্‌মদ (আ.) ইসলামের সেবা আরম্ভ করেন।

খ্রিস্টান ও আর্যদের প্রতিবাদে তিনি সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ পাঠাতে আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে তাঁর নাম ক্ষুদ্র গ্রামের সঙ্কীর্ণ পরিধি অতিক্রম করে বহির্জগতেও প্রকাশ পেতে শুরু করে। কিন্তু তখনও তিনি পূর্বের ন্যায় নির্জনে বাস করতে ভালবাসতেন এবং বাইরে খুব কম আসতেন। মসজিদের একটি ক্ষুদ্র কুঠুরীর মধ্যে (যার আয়তন ৫-৬ ফুটের বেশী ছিল না) কালাতিপাত করতেন। যদি কেউ সাক্ষাৎ করতে আসত, তাহলে মসজিদের বাইরে আসতেন অথবা নিজ ঘরে গিয়ে বসতেন। তাঁর খ্যাতি বাইরে ব্যাপ্ত হতে শুরু করলেও তিনি বাইরে বের হলেন না; আগের মতোই নির্জন বাস করতে লাগলেন।

ইলহামের প্রাচুর্য

এই সময়ে হযরত আহমদ (আ.) এর উপর আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হতে ক্রমান্বয়ে ঐশীবাণী বা ইলহাম হওয়া শুরু হয়ে যায়। সেই সকল ইলহামে নানা প্রকারের ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত থাকত, যা নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ হতে দেখে তাঁর ঈমান ক্রমাগত সুদৃঢ় হত। তাঁর বন্ধুগণের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দু ও শিখ ছিলেন। এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করে তাঁরা অতিশয় চমৎকৃত হতেন।

বারাহীনে আহ্‌মদীয়া প্রণয়ন

আহ্‌মদ এতদিন কেবল এখানেই ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ইসলামের শত্রুগণের আক্রমণ দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং মুসলমানগণ তার বেগ সহ্য করতে না পেরে পিছুপা হচ্ছে। একারণে তাঁর অন্তঃকরণ ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার মানসে অতিশয় ব্যগ্র হয়ে উঠল। এই সময় তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ হয় যে, ইসলামের মূলতত্ত্ব বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ করে তিনি যেন এমন একখানি পুস্তক রচনা করেন, যার সম্মুখে শত্রুগণ মস্তক অবনত করতে বাধ্য হয় এবং

ভবিষ্যতে যার অকাট্য যুক্তির সামনা সামনি হতে অতি বড় শত্রুও সাহসী না হয়। এই আদেশ অনুসারে তিনি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "বারাহীনে আহ্‌মদীয়া" প্রণয়ন করেন, যার খ্যাতি ভারতময় বিস্তার লাভ করল। এমন একখানি পুস্তক ইসলামের প্রারম্ভ হতে আজ পর্যন্ত আর কেউ লেখেন নি। এই পুস্তকের একাংশ যখন লেখা হয়ে গেছে তখন তিনি এর প্রচারকল্পে নানা স্থানে সাহায্যের জন্য পত্রাদি লেখেন। যে কতিপয় গুণগ্রাহী লোক ইতিপূর্বেই তাঁর প্রবন্ধে মেধা ও ধী-শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁরা তাঁকে কিছু অর্থ সাহায্য করেন। যদ্দারা তাঁর লিখিত অংশ নমুনা স্বরূপ মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়; যদিও এই অংশ অতি ক্ষুদ্র ছিল এবং বিজ্ঞাপনের মত প্রচারিত হয়েছিল তথাপি এতটুকুর মধ্যেই ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য এমন কতকগুলি অভিনব সূত্র সন্নিবেশিত হয় যে, যাঁর হাতেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পড়েছে তিনিই এর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেছেন। দেখতে দেখতে এ পুস্তক সম্বন্ধে দেশব্যাপী এক মহা আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

এই বিজ্ঞাপনে হযরত আহ্‌মদ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করেন যে, তিনি ইসলামের সত্যতার যে প্রমাণাদি এই গ্রন্থে উপস্থিত করবেন যদি কেউ তার নিজ ধর্ম হতে অনুরূপ প্রমাণ কিংবা তার অর্দ্ধেক অথবা এক চতুর্থাংশ প্রমাণও দেখাতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তি যার তৎকালীন মূল্য ছিল দশ হাজার টাকা, উক্ত ব্যক্তিকে পুরস্কার স্বরূপ দান করবেন। (এখানে এতটুকু বলে রাখা আবশ্যক যে, হযরত আহ্‌মদ এই সময়ে একবার মাত্র উপরোক্ত কারণ অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য আপন সম্পত্তি কাজে লাগাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন যেন ভিন্ন ধর্মের লোক পুরস্কারের আশায় আকৃষ্ট হয়ে সত্য ধর্মের বিজয় পতাকা উত্তোলনে সাহায্য করে।)

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে উক্ত গ্রন্থের ১'ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ২'য় খণ্ড, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ৩য় খণ্ড এবং ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৪র্থ খণ্ড

প্রকাশিত হয়। যেভাবে তিনি গ্রন্থ লিখতে মনস্থ করেছিলেন, কিছুদূর পর্যন্ত সেই ভাবে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ মাঝখানে থেমে যান। কারণ, এই পুস্তক লেখার সময়ে তিনি আল্লাহ্‌র আদেশপ্রাপ্ত হন যে, ইসলামের খেদমতের জন্য তাঁকে কাজ করতে হবে। তথাপি, তিনি যা লিখেছেন তাই সমগ্র জগতের চক্ষু উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট।

এই পুস্তক প্রচারের পর তাঁর শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন। শত্রু পক্ষের উপর এই পুস্তক এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, কেউই এর উত্তর লিখতে সমর্থ হয় নি। মুসলমানগণ আনন্দে এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, যদিও তিনি তখন মোজাদ্দেদ হওয়ার কোনও দাবি করেন নি তথাপি সকলেই তাঁকে এই জামানার মোজাদ্দেদ বলে স্বীকার করে নেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলেমগণও তাঁকে একজন শক্তিশালী পুরুষ হিসাবে মান্য করতেন। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নেতা মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী যিনি আহলে হাদীস ওহাবি সম্প্রদায়ের আলেমগণের মধ্যে অন্যতম। ওহাবি সম্প্রদায় তাঁকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত এবং সেজন্য তিনি গভর্নমেন্টের নিকটও সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি এই পুস্তকের আলোচনায় এক বৃহৎ প্রবন্ধ লেখেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, তেরশত বছরের মধ্যে ইসলামের সাহায্যকল্পে এরূপ পুস্তক আজ পর্যন্ত লিখিত হয় নি।*

*__অনুবাদকের পক্ষ হতে টীকা__ ঃ এখানে আমরা আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ নেতা মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী হযরত মসীহ্‌ মাওউদের বিখ্যাত গ্রন্থ বারাহীনে আহমদীয়ার আলোচনা উপলক্ষ্যে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তা উদ্ধৃত করলামঃ-

"বারাহীনে আহমদীয়ার গ্রন্থকার সম্বন্ধে আমি যতদূর অবগত আছি, আমার বিশ্বাস, আমার সমসাময়িক লোকগণের মধ্যে আর কেউই ততটা অবগত নন। গ্রন্থকার ও আমি এক স্থানেই বাস করি এবং বাল্যকালে আমরা একই মক্তবে পড়তাম। তখন আমি 'কুতমী' ও 'শরমোল্লা' পড়তাম। আমাদের উভয়ের মধ্যে বরাবর পত্র

অনবরত ইলহাম ও অদৃষ্টের সংবাদ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু

এই গ্রন্থে আহ্‌মদ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কতিপয় ঐশীবাণী (ইলহাম) লিপিবদ্ধ করেন। তার কয়েকটির বিবরণ এখানে দেওয়া সঙ্গত, কারণ পরবর্তীতে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছিল তা পরবর্তী ঘটনাবলী হতে জানা যাবে।

অবিশিষ্ট টীকা ঃ

বিনিময়, দেখা সাক্ষাৎ এবং ভাব বিনিময় চলত। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমি তাঁর অবস্থা ও মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত আছি। এখানে এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার কি মত তা সংক্ষেপে, কোন প্রকার অত্যুক্তি না করে প্রকাশ করছি। আমার মত এই যে, বর্তমান কালের প্রতি লক্ষ্য করলে একে একখানি আদর্শ পুস্তক বলা যেতে পারে। এমন একখানি মূল্যবান পুস্তক মুসলমান জগতে আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। বরং আগামীতে হবে কি না জানিনা। গ্রন্থকার তাঁর মন, প্রাণ তাঁর সুযোগ্য লেখনি, তাঁর বক্তৃতা শক্তি এবং তাঁর আদর্শ চরিত্র ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ইসলামের সেবার কাজ যেভাবে দৃঢ় ও অটলভাবে সম্পাদন করছেন, বোধ হয় তাঁর মত আদর্শ ব্যক্তি ইসলামের প্রথম অভ্যুদয় যুগেও খুব কম খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমার কথা শুনে যদি কেউ অতিরঞ্জন বলে মনে করেন তবে তিনি যেন এরূপ একখানি পুস্তকের নামোল্লেখ করেন যাতে সকল বিরুদ্ধ ধর্মের বিশেষতঃ আর্য্য সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রবল আক্রমণের গতিরোধ করা হয়েছে। তাঁকে আরও বলি যে, তিনি যেন ইসলামী জগতের এরূপ আরও দু-চারজন লোকের ঠিকানা বলে দেন যাঁরা ধন প্রাণ উৎসর্গ করে, লেখনি পরিচালনা করে এবং সর্বোপরি স্বীয় আদর্শ চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ইসলামের সেবা করেছেন এবং ইসলামের শত্রুগণকে এবং ইসলামের অস্বীকারকারীগণকে মহাবিক্রমে আহ্বান করে বলেছেন, 'যার ইলহামে সন্দেহ আছে আমার কাছে এসে তা স্বচক্ষে দেখে উপলব্ধি করে নাও' এবং যিনি বিধর্মী সম্প্রদায়ের সকলকে তার রসাস্বাদন করিয়েছেন।" (এশায়াতুস সুন্নাহ, জুন, জুলাই, আগষ্ট, ১৮৯৪ ইং)

"দুনিয়াতে একজন সতর্ককারী এসেছেন। দুনিয়া তাঁকে গ্রহণ করে নি, কিন্তু খোদা তাঁকে কবুল করবেন ও অতি প্রচন্ড আক্রমণসমূহ দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রকাশ করে দেবেন।" (তাযকিরা, পৃ. ১০৪)

"দূর দূরান্ত হতে তোমার নিকট সাহায্য সামগ্রী আসবে, সুদূর পথ অতিক্রম করে দলে দলে লোক আসবে।" (তাযকিরা, পৃ. ৫০, চতুর্থ সংস্করণ)

"বাদশাহ্‌গণ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।"

(তাযকিরা, পৃ. ১০, চতুর্থ সংস্করণ)

এই সকল ইলহাম ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন হযরত আহ্‌মদ (আ.) একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া মাত্র ভারতের চারিদিকে তাঁর সুখ্যাতি বিস্তার লাভ করে এবং অনেকের চক্ষু এই গ্রন্থকারের উপর নিপতিত হয়। এই পুস্তক পাঠে সকলেরই মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে, এই ব্যক্তি ইসলামের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং শত্রুর আক্রমণ হতে একে রক্ষা করবেন। তাদের এই বিশ্বাসের সঙ্গত কারণও ছিল। কিন্তু খোদাতা'লা তাঁর ইচ্ছা অন্য একভাবে পূর্ণ করলেন। পরবর্তী ঘটনাবলী হতে আমরা দেখতে পাব যে, যে সকল ব্যক্তি তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল তারাই পরবর্তীতে তাঁর রক্তপাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল এবং যে কোন ভাবেই তাঁর অনিষ্ট সাধন করবার চেষ্টা করতে লাগল। আমরা আরও দেখতে পাব যে, মানুষের সাহায্যে তিনি সত্য বলে গৃহীত হবেন না; খোদাতা'লা প্রেরিত নানাবিধ বিপদরাশির প্রবল আক্রমণের সাহায্যে তিনি সত্য বলে গৃহীত হবেন

১৮৮৪ সনে হযরত আহ্‌মদের ভাইয়ের মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন; সুতরাং হযরত আহ্‌মদই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি বিধবা ভ্রাতৃজায়ার মনস্তুষ্টির জন্য সম্পত্তি নিজ হাতে গ্রহণ করেন নি। ভ্রাতৃবধূর প্রার্থনানুযায়ী তিনি মির্যা সুলতান আহ্‌মদের নামে অর্দ্ধেক সম্পত্তি লিখে দেন। তাকে উক্ত বিধবা পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আহ্‌মদ

উক্ত দানপত্রে লেখেন যে, যদিও ইসলামে পোষ্যপুত্র রাখার বিধান নেই তথাপি পরলোকগত ভাইয়ের বিধবা পত্নীর মনস্তুষ্টি ও ভরণ পোষণের জন্য তিনি তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি স্বেচ্ছায় তাঁকে দান করলেন। বাকী অর্ধেক সম্পত্তিও তিনি নিজ হাতে গ্রহণ করলেন না। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তা তাঁর আত্মীয়দের ভোগ দখলে রইল।

দ্বিতীয় বিবাহ, সৃষ্টি সেবার প্রতি মনোনিবেশ,দাবির ঘোষণা

ভাইয়ের মৃত্যুর দেড় বছর পরে আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে তিনি দ্বিতীয় বার দিল্লী নগরে বিবাহ করেন। এই সময়ে, বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশের পর অনেকেই তাঁকে দেখতে আসতেন এবং পৃথিবীর নিভৃত কোণে অবস্থিত ক্ষুদ্র কাদিয়ান গ্রামটি এক মাস দুই মাস পর অতিথিবর্গের আগমনে উৎসবমুখর হয়ে উঠতে থাকে। বারাহীনে আহমদীয়ার প্রচার যতই বাড়তে থাকে তাঁর সুখ্যাতিও ততই প্রসার লাভ করতে থাকে। এই সময় হযরত মৌলবি নূরুদ্দীন সাহেবের মত প্রতিভাশালী মহাপুরুষও, যাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে শত্রু-মিত্র সকলেই মুগ্ধ হত, যিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে সভাতেই গমন করতেন সকলেই অবনত মস্তকে তাঁর মহত্ব স্বীকার করত এবং তাঁর স্তুতিকারী অনুরাগীগণের দলভুক্ত হত– তিনিও হযরত আহ্‌মদের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর ভক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেন। যখন বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশিত হয়, তখন তিনি জম্মুর মহারাজার দরবারে রাজ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ঐ স্থানেই উক্ত গ্রন্থ পাঠ করে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত আহ্‌মদের সানিধ্য পরিত্যাগ করেন নি।

মোট কথা, বারাহীনে আহমদীয়ার প্রভাব দিন দিন বাড়তে লাগল। কেউ কেউ হযরত আহ্‌মদের হাতে বয়া'ত গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তিনি সর্বদাই বয়া'ত গ্রহণে অস্বীকার করতেন। বলতেন -'আমার সকল কর্ম খোদার হাতে, তাঁর বিনা আদেশে আমি কিছু করতে পারব না।'

প্রচার জীবন

প্রকাশ্য দীক্ষা দান

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তাঁর উপর ইলহাম দ্বারা বয়া'ত নেওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হয়। তদনুসারে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে লুধিয়ানাবাসী মিয়াঁ আহ্‌মদ জান নামক এক নিষ্ঠাবান শিষ্যের বাড়িতে তিনি বয়া'ত গ্রহণ আরম্ভ করেন। সর্বপ্রথমে হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব বয়া'ত নেন। সেই দিনই প্রায় ৪০ জন লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ধীরে ধীরে আরও লোকজন তাঁর বয়া'ত করতে থাকেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ হবার দাবি ও ঘোষণা

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনে এক মহা পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই বছর তাঁর উপর ইলহাম বা ঐশীবাণী দ্বারা প্রকাশ করা হয় যে, হযরত মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.) যাঁর দ্বিতীয়বার আগমনের কথা মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ই বিশ্বাস পোষণ করে, সেই হযরত ঈসা (আ.) এর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর পৃথিবীতে প্রত্যাগমন একেবারেই অসম্ভব। হযরত ঈসার দ্বিতীয়বার আগমনের অর্থ এই যে, তাঁর গুণরাজিতে বিভূষিত করে আল্লাহ্‌তা'লা জনৈক মহাপুরুষকে ধরাপৃষ্ঠে প্রেরণ করবেন এবং তিনিই (হযরত আহ্‌মদ) সেই প্রতিশ্রুত পুরুষ। যখন তিনি এ বাক্যের প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করেন এবং এই সংবাদ জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করার জন্য বারংবার ইলহাম দ্বারা আদিষ্ট হতে থাকেন, তখন তিনি আর নীরব থাকতে পারলেন না। কাদিয়ানে এই ইলহাম তাঁর উপর নাযেল হয়। তিনি বাড়িতে বলেন, তাঁর উপর এমন কাজ সমর্পন করা হয়েছে যে, এখন থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ানক শত্রুতা আরম্ভ হবে। অতঃপর হযরত আহ্‌মদ লুধিয়ানায় গমন করেন এবং ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞাপন দ্বারা নিজেকে মসীহ্‌ মাওউদ রূপে জনসাধারণ্যে ঘোষণা করেন।

আলেমগণের কঠোর বিরোধিতা এবং লুধিয়ানাতে ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ

এই ঘোষণা প্রচার হওয়া মাত্রই সমগ্র ভারতে এক তুমুল আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতার ঝড় বইতে শুরু করে। যে আলেমগণ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন এখন তারাই তাঁর বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হন। যে মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী তাঁর "এশায়াতুস সুন্নাহ্" নামক পত্রিকায় বিখ্যাত বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের অতি প্রশংসা ভরা সমালোচনা প্রকাশ করেন, তিনিই তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগেন। তিনি দর্প সহকারে বলেন -'আমিই এই ব্যক্তিকে সম্মানের উচ্চ আসনে বসিয়েছিলাম এবং আমিই তাকে এই আসন হতে নামাব।' অর্থাৎ আমার সমর্থনে মর্যাদার উচ্চ আসনে আসীন হয়েছে এবং এখন আমি তার এতটাই বিরোধিতা করব যে, লোকচক্ষুতে হেয় প্রতিপন্ন হবে এবং বদ্‌নাম হয়ে যাবে। মৌলবি সাহেব আরও কয়েকজন আলেমসহ লুধিয়ানায় আগমন করেন এবং হযরত আহ্‌মদকে তর্কযুদ্ধে আহবান করেন। তিনিও তাতে সম্মত হন। কিন্তু যখন উভয় পক্ষ তর্ক বিচারে* প্রবৃত্ত হল, তখন বিরুদ্ধবাদীগণ এমন সব কু তর্কের অবতারণা করল যে আসল বিষয়ের কিছুই মীমাংসা হল না। যখন জেলার ডেপুটি কমিশনার সাহেব দেখেন যে, একটা বড় দাঙ্গা হাঙ্গামার উপক্রম হচ্ছে, তখন তিনি বিশেষ হুকুম জারী করে মৌলবি মুহাম্মদ হোসেনকে সেই দিনই লুধিয়ানা ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। হযরত আহ্‌মদ ভাবলেন হয়ত তাঁর উপরও লুধিয়ানা ছাড়বার হুকুম হতে পারে। এজন্য তদীয় বন্ধুবর্গের পরামর্শে তিনিও অমৃতসর চলে যান এবং সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। কিন্তু পরে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের

* টীকা ঃ এই ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ ২০'শে জুলাই ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় এবং কয়েক দিন যাবৎ চলতে থাকে। যেহেতু এই ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ লিখিতাকারে হয়েছিল সেহেতু "আল্‌হক্ মোবাহেসা লুধিয়ানা" নামে প্রকাশিত হয়। বিশদ জানতে উক্ত পুস্তক পাঠ করুন। (অনুলিপিকারী)

নিকট অনুসন্ধানে জানা গেল যে, লুধিয়ানা ছেড়ে যাওয়ার জন্য তাঁর প্রতি কোনও আদেশ হয় নি। এই সংবাদ পেয়ে হযরত আহ্‌মদ পুনরায় লুধিয়ানায় গমন করেন। সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ অতিবাহিতের পর কাদিয়ানে চলে আসেন।

দিল্লী মুবাহেলা

কিছুদিন কাদিয়ানে কাটিয়ে হযরত আহ্‌মদ পুনরায় লুধিয়ানায় পদার্পন করেন এবং সেখান থেকে দিল্লী নগরীতে গমন করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের সকালে দিল্লী পৌঁছান। যেহেতু দিল্লী নগরী ছিল হিন্দুস্থানের জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল, সেজন্য সেখানকার অধিবাসীগণ পূর্ব হতেই তাঁর বিরূদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছিল। তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হয়েছেন জেনে আলেমবর্গের মধ্যে অসাধারণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাঁরা হযরত আহ্‌মদকে তর্কযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিতে শুরু করে। সেই সময় মৌলানা নাযির হোসেন আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের আলেমগণের ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ হওয়া স্থির হল। প্রতিপক্ষরা দিল্লীর বিখ্যাত জামে মসজিদে মজলিসের স্থান নির্ধারণ করে। কিন্তু তারা সভার কাল ও স্থান সম্বন্ধে হযরত আহ্‌মদকে কিছুই জানায় নি। ঠিক নির্ধারিত সময়ে হেকিম আব্দুল মজিদ খাঁ সাহেব নিজের গাড়িতে হযরত আহ্‌মদের সামনে এসে বলেন, চলুন মসজিদে বাহাস হবে। হযরত আহ্‌মদ বলেন, 'সেখানে শান্তিভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে। সরকারিভাবে শান্তিরক্ষার বন্দোবস্ত না হলে আমি যেতে পারব না। তারপর বাহাস সম্বন্ধেও আমার সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল। বাহাসের বিষয় ও শর্তাদি স্থির হওয়ার পর বাহাসে অংশ গ্রহণ করা উচিত।

তিনি যেতে স্বীকৃত না হওয়ায় মহা গোলযোগ বেঁধে যায়। অবশেষে তিনি বলেন, "যদি মৌলানা নাযির হোসেন সাহেব শপথ করে বলতে পারেন

যে, কুরআন শরীফের উক্তি অনুসারে হযরত ঈসা মসীহ্ আজও জীবিত আছেন এবং এখনও তাঁর মৃত্যু হয় নি এবং এই মত প্রকাশের পর এক বছরের মধ্যে যদি তাঁর উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাযেল না হয়, তাহলে আমি নিজেকে মিথ্যাবাদী স্বীকার করব এবং আমার লিখিত গ্রন্থাবলী অগ্নিসাৎ করব'। এইরূপ পরীক্ষার জন্য তিনি একটি তারিখও ঘোষণা করেন। তখন মৌলানা নাযির হোসেনের শিষ্যবর্গ চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সর্বসাধারণ বলে ওঠে, এতে ক্ষতি কি? মির্যা সাহেব কী দাবি করেন তা শুনে মৌলানা সাহেব শপথ করে বলুন যে, মির্যা সাহেব একজন মিথ্যাবাদী। এদিকে মসজিদ লোকে লোকারণ্য, সকলেই মির্যা সাহেবের আগমন প্রতীক্ষায় উদগ্রীব। অনেকে হযরত আহ্‌মদকে মসজিদে যেতে নিষেধ করেন; কারণ সেখানে গুরুতর দাঙ্গা হাঙ্গামা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাঁর সঙ্গে কেবল ১২ জন বন্ধু ছাড়া আর কেউ ছিল না। (হযরত ঈসা (আ.) এর বারজন হাওয়ারী ছিল। বর্তমান ঘটনাকালে হযরত মসীহ্ মাওউদের ১২ জন সঙ্গী থাকা তাঁদের পরস্পর অবস্থায় এক সাদৃশ্য বিরাজমান ছিল এবং এটি একটি নিদর্শন।) জামে মসজিদের ভিতর ও বাইরে লোকে পরিপূর্ণ ছিল। এমনকি সিঁড়ির উপরও বহু লোক দাঁড়িয়ে ছিল। যখন শত-সহস্র লোক ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থায় আরক্ত নেত্রে তাঁকে অবলোকন করছিল, তখন তিনি মুষ্টিমেয় সহচর পরিবৃত হয়ে ধীর পদক্ষেপে মসজিদে প্রবেশ করে মেহরাবের মধ্যে উপবেশন করলেন। মসজিদে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের সুপারিন্টেডেন্ট ও অন্যান্য অফিসারগণ প্রায় ১০০ জন কনেষ্টবল সহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সমাগত দর্শকমন্ডলীর মধ্যে অনেকেই কাপড়ের মধ্যে পাথরের টুকরো এনেছিল যেন সামান্য সঙ্কেত পেলেই তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করতে পারে। প্রথম মসীহ্ (হযরত ঈসা) যেরূপ সেই জামানায় আলেমদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন, দ্বিতীয় মসীহ্ (হযরত আহমদ) তেমনি এই জামানার আলেমগণ কর্তৃক নির্যাতিত হতে চললেন। তাঁকে শূলে লটকাবার বন্দোবস্ত না হলেও মনে হচ্ছিল

যেন সকলে তাঁকে পাথরের স্তূপে প্রোথিত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

তর্কযুদ্ধে তাদের হার মানতে হয়। ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু সম্বন্ধে কেউই তর্ক করতে চাইল না। কেউই শপথ করতে সাহস করল না এবং মৌলানা নাযির হোসেন সাহেবকেও শপথ করতে দিল না। আলিগড়ের উকিল মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের প্রার্থনানুসারে হযরত আহ্‌মদ তাঁর মূল বিশ্বাসগুলি লিপিবদ্ধ করে তাঁর হাতে সমর্পণ করলে তিনি সর্বসমক্ষে তা পাঠ করতে উদ্যত হন। কিন্তু যেহেতু মৌলবিগণ জনসাধারণকে এই বলে প্রতারিত করেছিল যে, মির্যা সাহেবের কুরআন বা হাদীস অথবা হযরত রসূলে করীম (সাঃ) কারও উপর ঈমান নেই, এখন তাদের প্রবঞ্চনা ধরা পড়বে ভেবে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তুমুল গোলমাল আরম্ভ করে দিল এবং মৌলবি মোহাম্মদ ইউসুফকে এ কাগজখানি পাঠ করার এতটুকু অবকাশ দিল না।

যখন পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব দেখলেন যে, অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি ভিড় ভাঙ্গার জন্য পুলিশকে হুকুম দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, কোনও প্রকারের বাহাস (তর্ক) আর হবে না। তখন পুলিশগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে হযরত আহ্‌মদ বাইরে আসেন। গাড়ির জন্য তাঁকে কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করতে হয়। দেখতে দেখতে সেখানে অনেক লোক একত্রিত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তখন পুলিশের বড় সাহেব তাঁকে গাড়িতে চড়িয়ে গৃহাভিমুখে রওনা করে দিলেন এবং স্বয়ং জনতার ভিড় ভাঙ্গতে চললেন।

এই ঘটনার পর দিল্লীর অধিবাসীগণ মৌলবি মোহাম্মদ বশির সাহেবকে মির্যা সাহেবের সঙ্গে বাহাস করার জন্য ভূপাল হতে আনয়ন করে। ঐ তর্ক-যুদ্ধের বিবরণ মুদ্রিত হয় এবং এখনও বর্তমান আছে।

ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথমের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ

কিছুদিন পরে হযরত আহ্‌মদ কাদিয়ানে ফিরে আসেন। কয়েক মাস পর ১৮৯২ সনে তিনি আবার প্রচারে বের হন, প্রথমে লাহোরে যান। সেখানে মৌলবি আব্দুল হাকিম কালানুরীর সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ হয়। সেখান থেকে শিয়ালকোট, জলন্ধর, লুধিয়ানা হয়ে কাদিয়ানে ফিরে আসেন।

১৮৯৩ সনে খ্রিস্টানদের সঙ্গে তাঁর তর্ক-যুদ্ধ হওয়া স্থির হয়। খ্রিস্টানদের পক্ষে ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথম প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। পনের দিন পর্যন্ত এই তর্ক-যুদ্ধ অমৃতসরে চলতে থাকে। এই বাহাসের বিস্তারিত বিবরণ "জঙ্গে মুকাদ্দাস" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে।

ইতিপূর্বে যে সকল তর্ক–যুদ্ধ হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতেই যেমন বিপক্ষের পরাজয় হয়েছিল, এই যুদ্ধেও তেমনি খ্রিস্টানগণ সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হয়। এই তর্ক-যুদ্ধের ফল বিশেষ মঙ্গলজনক হয়েছিল। (বাহাস মৌখিক না হয়ে কাগজে কলমে লিখিত বাহাস হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দীগণ পরস্পর সম্মুখীন হয়ে বসে পরস্পর লিখিত যুক্তির উত্তর লিখতেন। সমুদয় লিখিত বিষয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে।) এই বিবরণ পাঠ করলে জানা যায় যে, খ্রিস্টানগণ বার বার তাঁর কঠোর যুক্তির সম্মুখে নিরুপায় হয়ে পড়ত এবং বার বার তাদের প্রমাণ্য বিষয়গুলি পরিবর্তন করত। কোথাও দেখা যায় যে, তারা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করে নি। হযরত আহ্‌মদ তর্ক শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত সূত্র অনুযায়ী প্রস্তাব করেন যে, উভয় পক্ষই স্বীয় ধর্মমতের সত্যতা প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করবেন তা তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ হতে গ্রহণ করতে হবে। এই তর্কযুদ্ধে শত্রু মিত্র সকলেই তাঁর খোদা প্রদত্ত অসাধারণ ধীশক্তির প্রশংসা না করে থাকতে পারে নি। এমন কি তিনি যে দৈবশক্তির সহায়তাপ্রাপ্ত একথাও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় নি। একদিন খ্রিস্টানগণ

তাঁকে জব্দ করবার জন্য সভাগৃহে অনেক অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠগ্রস্থদের একত্র করে এবং বলে, আপনি মসীহ্ দাবি করেছেন; মসীহ্ অন্ধ, খঞ্জ ও কুষ্ঠগ্রস্থকে আরোগ্য করতেন। আপনিও যদি এই সকল ব্যক্তিকে আরোগ্য করে দেখাতে পারেন তবে আপনার দাবি সত্য বলে গৃহীত হতে পারে। আপনাকে বেশী দূরে যেতে হবে না; তারাই আপনার সম্মুখেই উপস্থিত। সভাগৃহে সমবেত জনমন্ডলী স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। সকলেই মির্যা সাহেবের উত্তর শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইল। এদিকে খ্রিস্টানগণ আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমাবেশে তারা খুবই পরিতুষ্ট হল এবং ভাবতে লাগল, আজ তর্কযুদ্ধের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে এবং মির্যা সাহেব নিশ্চয়ই পরাজিত হবেন এবং তাঁকে এই জনসাধারণের সমক্ষে অপদস্ত হতে হবে। কিন্তু হায়! যখন মির্যা সাহেবের মুখ হতে উক্ত প্রশ্নের উত্তর নির্গত হল, তখন তাদের আনন্দ বিষাদে পরিণত হল। মুহূর্ত কালের জয় চির পরাজয়ে পর্যবসিত হল। সকলেই তাঁর উত্তর শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হল। তিনি বলেন-এই ভাবে রোগী আরোগ্য করার কথা ইঞ্জিলে লেখা আছে। আমরা তো এটি বিশ্বাস করি না; মানি না। বরং তাঁর (হযরত ঈসার) মো'জেযা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এ তো ইঞ্জিলের দাবি যে, হযরত ঈসা এই সকল শারীরিক ব্যাধি কেবল হস্ত সঞ্চালন দ্বারা, দোয়া অথবা ঔষধের সাহায্য ছাড়াই আরোগ্য করতেন। কিন্তু ইঞ্জিলে এও তো লেখা আছে যে,"তোমাদের মধ্যে যদি তিল পরিমাণও ঈমান থাকে তাহলে তোমরাও এর চাইতে কঠিন অসাধ্য সাধন করতে পারবে।" সুতরাং এই সকল বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণকে উপস্থিত করা আপনাদের কাজ নয়; আমারই কাজ। আপনারা অনুগ্রহ করে যে সকল রুগ্ন ব্যক্তিকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করেছেন, এখন আমি তাদেরকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করছি এবং আপনাদের নিকট এই নিবেদন করছি যে, যদি আপনাদের নিকট এক তিল পরিমাণ ঈমান থাকে, তাহলে আপনারা এদের উপর হাত রেখে বলুন, 'তোমরা রোগমুক্ত

হও' যদি তারা আরোগ্যলাভ করে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে, আপনারা ও আপনাদের ধর্মই সত্য। নতুবা যে দাবি আপনারা নিজে করেছেন তা যদি সম্পাদন করে না দেখাতে পারেন, তবে কীভাবে বিশ্বাস করব যে, আপনাদের ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? এই কথার কোন উত্তর দিতে না পেরে খ্রিস্টানগণ একেবারে চুপ হয়ে যায় এবং সংগোপনে শীঘ্রই ঐ সকল রোগীকে তাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করে।*

অতঃপর হযরত আহ্‌মদ ফিরোজপুরে শুভাগমন করেন। যে স্থানে তিনি পদার্পন করতেন সর্বত্রই তাঁকে অপদস্ত করবার আয়োজনের ত্রুটি হত না। তাঁর বিরুদ্ধে যে কত প্রকারের বিজ্ঞাপনাদি ছাপান হয়েছিল তার ইয়াত্তা নেই। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই তাঁকে নানা প্রকার ক্লেশ দেওয়া হত।

* টীকা ঃ পক্ষান্তরে হযরত মির্যা সাহেব ইসলামের সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ এই তর্কযুদ্ধে খ্রিস্টান প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে তর্কযুদ্ধের শেষ দিন–১৫ তম দিবসে আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ হতে খবর পেয়ে ঘোষণা করেন যে, সে যেহেতু তাহার এক লিখিত পুস্তকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে (নাউযুবিল্লাহ্)'দাজ্জাল' বলেছে, সেহেতু যদি সে ভীত ও সত্যের দিকে রুজু না করে ১৫ মাসের মধ্যে নিপাত হয়ে হাবিয়া দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী শোনা মাত্র আথম ভীত হয় এবং অতি সন্ত্রস্ত অবস্থায় উক্ত মেয়াদকাল অতিবাহিত করে। ফলে উক্ত ১৫ মাসে সে মৃত্যুর কবল হতে বেঁচে যায় কিন্তু বারংবার হযরত মির্যা সাহেবের পক্ষ হতে চ্যালেঞ্জ দেওয়া সত্ত্বেও পাদ্রীদের চাপে পড়ে তার ভয়ানক রূপে ভীত হওয়ার কথা গোপন করায় পুনরায় হযরত মির্যা সাহেবের পক্ষ হতে ঘোষণাকৃত ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী শীঘ্র সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।-অনুবাদক

পবিত্র জুমআর দিন সরকারি ছুটি ঘোষণার জন্য প্রচেষ্টা

১৮৯৬ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইসলামের হিতকল্পে হযরত আহ্‌মদ ইসলামের পবিত্র অনুষ্ঠান জুমআর নামাযের অধিকতর প্রসারের জন্য এক প্রচেষ্টা শুরু করেন। গভর্ণমেন্ট যাতে শুক্রবারকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করেন সে উদ্দেশ্যে লেখালেখি আরম্ভ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময় জুমআর নামায সম্বন্ধে নানা প্রকার কুসংস্কার দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। যে অবস্থায় জুমআর নামায ফরজ হয়, তদ্রূপ অবস্থা বর্তমানে এদেশে বিদ্যমান আছে কিনা এবং তার অভাবে এদেশে জুমআর নামায ফরজ কিনা এই বিষয় নিয়ে বিষম বিতর্ক শুরু হয়েছিল। হযরত মসীহ্‌ নাযেল হওয়ার একটি লক্ষণ পূর্ণ হওয়ার জন্যই যেন এইরূপ একটা অবস্থা– একটা বিপর্যয় ঘটেছিল। হযরত আহ্‌মদ আবার জুমআর নামাযকে নবজীবন দান করেন। তাঁর ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে, সরকার বাহাদুর শুক্রবারকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গভর্ণমেন্টের নিকট এক মেমোরেন্ডাম দেওয়ার মনস্থ করলেন। কিন্তু মৌলবিগণ তাদের চিরন্তন অভ্যাসদোষে তাঁর কাজে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হল। এই কাজ তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিজেরাই সম্পন্ন করতে চাইল। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই এই কাজ হাতে নিয়েছিলেন; কোন প্রকার প্রশংসার লোভে নয়। ধর্মের কাজ যার দ্বারাই সম্পন্ন হোক না কেন তিনি তুল্যরূপে আনন্দিত হতেন। সুতরাং যখন মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী এই কাজে অগ্রসর হলেন, তখন তিনি সে সম্পর্কিত সকল কাগজ-পত্র তাঁর হাতে সমর্পণ করে ঘোষণা করেন যে, এরপর জুমআর নামাযের সরকারী ছুটির জন্য চেষ্টা করার ভার মৌলবি মুহাম্মদ হোসেনের উপর ন্যাস্ত হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন এই পুণ্য কাজের কিছুই করেন নি। বরং তাঁর হাতে

যাওয়াতে এই কাজ অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। যাইহোক, এই চেষ্টা সদিচ্ছা প্রসূত ছিল বলে অবশেষে হযরত আহ্‌মদের প্রতিষ্ঠিত জামা'তের দ্বারাই এই কার্য সাফল্যমন্ডিত হয়।

লাহোর সর্ব ধর্ম সম্মেলন

১৮৯৬ সনের শেষের দিকে কয়েক জন লোক মিলে লাহোরে একটি ধর্মসভার আয়োজন করেন এবং সেই সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল ধর্মের অনুগামীগণকে আহ্বান করেন। সকলেই আনন্দের সঙ্গে উক্ত সভায় যোগদানে সম্মত হন। সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, আলোচনা কালে কোন ধর্মমতের উপর অযথা আক্রমণ করা হবে না। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণকে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে আনার জন্য অনুরোধ করা হয়-

১) মানবের শারীরিক, নৈতিক ও অধ্যাত্মিক অবস্থা কী?

২) মৃত্যুর পরের অবস্থা কী?

৩) পৃথিবীতে মানুষের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কী এবং তা কী উপায়ে সাধিত হতে পারে?

৪) মানুষ ইহলোক ও পরলোকে কীরূপে কর্ম ফল ভোগ করবে?

৫) কোন কোন উপায়ে ঐশী জ্ঞান লাভ সম্ভব?

এই ধর্ম সভারই একজন উদ্যোগী ব্যক্তি কাদিয়ানে হযরত আহ্‌মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সাধ্যমত সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন। এরূপ বলা যেতে পারে যে, হযরত আহ্‌মদই একরকম এই সভার ভিত্তি স্থাপন করেন; কারণ তিনি ঐ ব্যক্তিকে উপরোক্ত মতে সভার আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারণ করতে পরামর্শ দেন। সেই সভার প্রথম বিজ্ঞাপন কাদিয়ান হতেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি নিজ শিষ্যমন্ডলী হতে একজনকে এই কাজে সাহায্য করবার জন্য নিযুক্ত করেন। যেহেতু পৃথিবীতে সত্যের প্রচার করাই তাঁর আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁর কাজে বৃথা আড়ম্বর মোটেই ছিল না।

উপরোক্ত সম্মেলনে পাঠ করবার জন্য তিনি একটি প্রবন্ধ লিখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। যখন প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেন তখন হযরত আহ্‌মদ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর দাস্ত আরম্ভ হয়! এই অবস্থার মধ্যেই তিনি প্রবন্ধ লেখা শেষ করেন। যখন প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল তখন তাঁর নিকট ইলহাম হল–"তোমার প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট হবে।" অর্থাৎ তাঁর প্রবন্ধ অন্যান্য প্রবন্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হবে। তিনি তৎক্ষণাৎ এক বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে সভা আরম্ভ হবার পূর্বেই প্রকাশ করেন যে, তাঁর প্রবন্ধই সর্বোৎকৃষ্ট হবে।

সভার তারিখ ছিল ১৮৯৬ সনের ২৬,২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর। সভার কার্য্য পরিচালনার জন্য ছয় জন মডারেটর মনোনীত করা হয়েছিল;

১) রায় বাহাদুর প্রতুল চন্দ্র; জজ, চিফকোর্ট পঞ্জাব।
২) খান বাহাদুর সেখ খোদাবখস; জজ, নিম্ন আদালত, লাহোর।
৩) রায় বাহাদুর পন্ডিত রাধাকিশন কোল; প্লিডার, চিফকোর্ট (ভূতপূর্ব জেনারেল গর্ভনর, জম্মু)
৪) হযরত মৌলবি হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ); রাজ চিকিৎসক, জম্মু ও কাশ্মীর।
৫) রায় বাহাদুর ভবানী দাস; এম.এ এক্সট্রা সেটেলমেন্ট অফিসার, ঝিলম।
৬) সরদার জওহর সিং; সেক্রেটারী, খালসা কলেজ কমিটি, লাহোর।

এ সভার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রসিদ্ধ আলেম ও পন্ডিতগণ রচনা তৈরী করে এনেছিলেন। সেজন্য বহু লোক সভার কার্যে কৌতুহলী হয়েছিল এবং উৎসাহের সঙ্গে সম্মেলনে যোগদান করেছিল। সম্মেলন গৃহটি যেন বিভিন্ন ধর্মমতের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক ধর্মের অনুগামীগণই স্বীয় ধর্মের প্রতিনিধিগণকে জয়যুক্ত দেখবার জন্য আশান্বিত হয়ে রইল। যত পুরাতন ধর্মমত প্রচলিত আছে, তাদের সকলেই প্রতিনিধি কর্তৃক সভাস্থল পূর্ণ হয়ে গেল। তাদের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহ দাতার অভাব

রইল না। কিন্তু মির্যা সাহেবের রচনা এমন এক সভায় পঠিত হতে চলল, যেখানে প্রায় সকলেই তাঁর শত্রু, মিত্র ২/১ জনের বেশী নয়। তারাও প্রকৃত বন্ধু নয়। তখন তাঁর জামাতে ২/৩ শত লোকের বেশী ছিল না। তাঁর শিষ্যমন্ডলীর মধ্যে অনধিক ৫০ জন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর রচনা পাঠের তারিখ ২৭শে ডিসেম্বর বেলা দেড়টা থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। স্বয়ং অসুস্থতার জন্য তিনি নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি তাঁর একজন ভক্ত শিষ্য মৌলবি আব্দুল করিম সাহেবকে তাঁর রচনা পাঠের জন্য নিযুক্ত করেন। মৌলানা সাহেব প্রবন্ধ পাঠ করতে শুরু করলে সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় (ছবির মতো নিশ্চল) বাহ্য জ্ঞানশূন্য হয়ে শুনতে থাকে। নির্দিষ্ট সময় কীভাবে পার হয়ে গেল কেউই বুঝতে পারল না। যখন তাঁর সময় শেষ হয় তখনও ১'ম প্রশ্নের উত্তর শেষ হয় নি। তখন শিয়ালকোটের মৌলবি মোবারক আলী সাহেব প্রস্তাব করলেন যে, তাঁর নিজের রচনা পাঠের জন্য নির্দিষ্ট সময়ও এই পাঠকারীকে দেওয়া হোক। ফলতঃ সমবেত জনমন্ডলী অত্যন্ত আনন্দিত হল। সকলেই রচনা অসমাপ্ত দেখে চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। বেলা সাড়ে চারটে পর্যন্ত প্রবন্ধ পাঠ চলতে থাকে। তখনও প্রথম প্রশ্নের উত্তর সমাপ্ত হয় নি। তখন সভাপতি ঘোষণা করেন যে, সময় উত্তীর্ণ হওয়ার সত্ত্বেও এই প্রবন্ধ পাঠ চলতে থাকুক। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় প্রথম প্রশ্নের উত্তর শেষ হয়। তারপর সকলে ধরে বসল যে, সভার অধিবেশনের তারিখ আরও এক দিন বাড়িয়ে দেওয়া হোক যেন এই প্রবন্ধ সমাপ্ত হতে পারে। সে মতে ২৯শে তারিখ পর্যন্ত সভার অধিবেশনের বন্দোবস্ত হয়। পরদিন কয়েকটি ধর্মমতের প্রতিনিধিগণ সময়ের জন্য প্রার্থনা করেন। এজন্য সভার কার্য্য সাড়ে দশটার পরিবর্তে সাড়ে ন'টায় আরম্ভ হয়। সর্ব প্রথমেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রচনা পাঠ করার কথা। প্রথম দিন সভার কার্য সাড়ে দশটার সময় আরম্ভ হবার কথা ছিল। কিন্তু সাড়ে দশটার মধ্যে খুব একটা লোক আসে নি। কিন্তু মৌলবি আব্দুল করিমের

রচনা পাঠের এতদূর প্রভাব পড়েছিল যে, সভার ২'য় দিন ৯টা বাজতেই সকল ধর্ম ও মতবাদের প্রতিনিধিগণ দলে দলে সভাস্থলে প্রবেশ করতে শুরু করেন। সেই দিন তাঁকে পূর্ণ আড়াই ঘন্টার সময় দেওয়া সত্ত্বেও রচনা অসমাপ্ত থেকে যায়। তখন সমবেত জনমন্ডলীর আগ্রহে তাঁকে আরও সময় দেওয়া হয়। যাইহোক মডারেটর সাহেব তাঁকে আরও সময় দেন। অতএব দুই দিনে প্রায় সাড়ে সাত ঘন্টা এই রচনা পাঠের পর প্রবন্ধ শেষ হয়। এই ঘটনার পরে লাহোরে হুলস্থুল পড়ে যায়। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে যে, মির্যা সাহেবের রচনাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। সকল ধর্মাবলম্বী লোকই এই রচনার সৌন্দর্য অপকট ভাবে অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। রিপোর্টারগণ লেখেন যে, তাঁর রচনা পাঠ কালে জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে প্রায় আট হাজারে পরিণত হয়েছিল। এই উপলক্ষে যে বিজয় মুকুট তাঁর মাথায় শোভা পায়, তার প্রভাব শত্রুগণের হৃদয়েও বিস্তার লাভ করে। তাঁর বিরোধী সংবাদ-পত্রসমূহেও তাঁর রচনা সর্বোৎকৃষ্ট বলে স্বীকৃত হয়। এই রচনা ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয়ে 'The Philosophy of Teachings of Islam' নামে ইউরোপ ও আমেরিকায় সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে।

১৮৯৭ সনে খ্রিস্টানগণের পরাভব একেবারে চরমে পৌঁছানোর জন্য হযরত আহ্‌মদ আর এক উপায় অবলম্বন করেন। হযরত ঈসা (আ.) এর প্রকৃত স্বরূপ প্রতিপন্ন করার জন্য এবং তাঁকে ঈশ্বর রূপে বিশ্বাস করায় তাঁর সম্বন্ধে যে সকল অতিরঞ্জিত ও অমূলক বিশ্বাস খ্রিস্টান সমাজে বিস্তৃতি লাভ করেছে, তা দূরীকরণার্থে তিনি বিজ্ঞাপন দ্বারা তাদেরকে চল্লিশ দিন যাবৎ বিচারে আহ্বান করেন। এই বিজ্ঞাপনে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকেও আহ্বান করা হয়েছিল, অবশ্য তাঁর দৃষ্টি খ্রিস্টানদের উপরই বিশেষরূপে নিবদ্ধ ছিল। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, যদি তাদের মধ্যে কেউ প্রমাণ করতে পারে যে, হযরত ঈসার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ তাঁর নিজ ভবিষ্যদ্বাণী হতে কোনও অংশে শ্রেষ্ঠতর, তাহলে তিনি সেই ব্যক্তিকে এক হাজার

টাকা পুরস্কার দেবেন।

লেখরামের নিহত হবার ঘটনা

১৮৯৭ সনের ৬ই মার্চ তারিখে লেখরাম নামক আর্য সমাজের জনৈক নেতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর এক ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মারা যায়। এর ফলে আর্য সমাজে তাঁর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হয়। কোন কোন দুষ্ট লোক আহ্‌মদীদেরকে, সেইসঙ্গে অন্যান্য মুসলমানদেরকেও নানা প্রকার যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করে। এমন কি হযরত আহ্‌মদের উপর প্রকাশ্যভাবে খুনের অপবাদ আরোপ করে। খুনের প্রমাণাদি সংগ্রহের জন্য ঘরতল্লাশীও হয়। কিন্তু খোদা যাঁর সহায়, শত্রুগণ তাঁর কী করতে পারে? তারা ব্যর্থ হয়। বিপক্ষের সকল প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ সাব্যস্ত হন।

তুর্কী দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে এক অভাবনীয় ঘটনার সূচনা হয়। এটি ইতিহাসে এক স্মরণীয় নিদর্শন হয়ে থাকবে। তুরস্কের কন্‌সল হোসেইন কামি বারংবার অনুরোধের পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি লাভ করে কাদিয়ানে উপস্থিত হন। হযরত আহ্‌মদ, মসীহ্ মাওউদ (আ.) তুর্কী দূতের নিকট খোদা প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও ইলহামের আলোকে তার নিজের অবস্থা এবং তুরস্কের আসন্ন বিপদের বিষয় ইঙ্গিত করেন। দূত তুরস্কের সাম্রাজ্যের পক্ষে বিশেষ দোয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে অনুরোধ করলে তিনি পরিষ্কার জবাব দেন, "তুরস্কের সুলতানের স্বীয় রাজ্যের অবস্থা ভাল নয়। দিব্য দৃষ্টিতে তাঁর রাজ্য পরিচালকবৃন্দের অবস্থা আমি ভাল দেখছি না এবং আমার নিকট তার পরিণাম ভাল বোধ হচ্ছে না।"

তূর্কী দূত এই কথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চলে যান এবং লাহোরের এক সংবাদপত্রে তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে এক পত্র প্রকাশ করেন। ফলতঃ সমগ্র ভারত ও পঞ্জাবের মুসলমানগণ তাঁর (আ.) উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা তাঁর বাক্যের সত্যতা উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। তুর্কী দূত তাঁর প্রসিদ্ধ ইলহাম "ইন্নি মুহিনুন মান আরাদা ইহানাতাকা।" অর্থাৎ 'যে তোমাকে অপমান করার ইচ্ছা করে, আমি তাকে লাঞ্ছিত করব'-এর মর্মানুসারে শাপগ্রস্থ হয়ে হঠাৎ এক গুরুতর অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হন। যে সংবাদপত্র অত্যন্ত জোরের সঙ্গে উপরোক্ত চিঠির মর্ম সমর্থন করেছিল সেই সংবাদপত্রও রাজকীয় দন্ড হতে নিষ্কৃতি লাভ করে নি এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবস্থা যে কী হয়েছিল তাও সকলের জানা কথা।

ডা. মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমা

এই বছর ১'লা আগস্ট তারিখে ডা. মার্টিন ক্লার্ক নামক একজন পাদ্রী অমৃতসরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ.ই. মার্টিনো সাহেবের এজলাসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এক খুনের অভিযোগ নিয়ে আসে। অভিযোগঃ- মির্যা সাহেব আব্দুল হামিদ নামক এক ব্যক্তিকে উক্ত পাদ্রী সাহেবকে খুন করবার জন্য প্রেরণ করেন। মিঃ মার্টিনো মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারী করেন। কিন্তু যখন জানা গেল যে, এই ঘটনা ভিন্ন জেলায় সংঘটিত হয়েছে এবং ওয়ারেন্ট জারী করা তাঁর এখতিয়ার বহির্ভূত, তখন উক্ত মোকদ্দমা গুরদাসপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে স্থানান্তরিত করা হয়। উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নাম ছিল এম. ডব্লিউ ডগ্লাস। বর্তমানে (এই পুস্তকের মূল উর্দু সংস্করণ লেখার সময়-অনুবাদক) তিনি আন্দামান দ্বীপের চীফ কমিশনার পদ হতে পেনশন প্রাপ্ত হয়ে বিলাতে অবস্থান করছেন। তাঁর নিকটেও আব্দুল হামিদ প্রকাশ করে যে, তাকে মির্যা সাহেব ডা. মার্টিন ক্লার্ককে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এই

ব্যক্তি অমৃতসরে যে জবানবন্দী দিয়েছিল তার সঙ্গে গুরদাসপুরের জবানবন্দীর স্থানে স্থানে গরমিল ছিল। এজন্য ডগ্লাস সাহেবের মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধানে রত হলেন এবং চারবার শুনানীর পর ২৭ দিনের মধ্যেই মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করেন। যদিও হযরত আহ্‌মদের বিরুদ্ধে ছিল একদল খ্রিস্টান সম্প্রদায় তথাপি তিনি সামান্য পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই মির্যা সাহেবের পক্ষে রায় দেন এবং তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করতে অনুমতি দেন। কিন্তু মির্যা সাহেব উক্ত পাদ্রী সাহেবকে ক্ষমা করে দেন এবং তার বিরুদ্ধে আর মোকদ্দমা দায়ের করেন নি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উক্ত রায়ে লিখেছিলেনঃ– "এই ব্যক্তির জবানবন্দী শুনেই ঘটনা অসম্ভব বলে আমার মনে হয়। প্রথমতঃ সাক্ষী আমার নিকট যে জবানবন্দী দিয়েছে সেখানে এবং অমৃতসরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে দেওয়া জবানবন্দীতে অনেক অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া তার ভাব-ভঙ্গীও সন্দেহজনক বলে মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ আর একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ব্যক্তি যত দিন বাটালা মিশনের কর্মচারীদের সহচর্যে ছিল তার উক্তিও তত দীর্ঘায়িত হচ্ছিল। সে প্রথম জবানবন্দী দেয় ১২'ই আগস্ট এবং দ্বিতীয় ১৩'ই আগস্ট। কিন্তু প্রথম দিনের বর্ণনা হতে দ্বিতীয় দিনের বর্ণনা অধিক দীর্ঘ ও খুঁটিনাটিপূর্ণ। যেহেতু আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, হয় তাকে কেউ শিখিয়ে দিচ্ছে, নতুবা সে যা জানে সবকথা বলছে না। এই কারণে ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব যিনি একজন ইরোপীয় ছিলেন, তাঁকে আদেশ দিই যে, তাকে মিশন থেকে সরিয়ে তাঁর নিজ জিম্মায় রাখুন। অতঃপর জবানবন্দী নিন। তখনই ঐ ব্যক্তিকে মিশন হতে সরিয়ে এনে পুনরায় তার জবানবন্দী নেওয়া হয়। তখন ঐ ব্যক্তি ক্ষমা লাভের কোন প্রতিশ্রুতি না পেয়েও কেঁদে কেঁদে তাঁর পায়ে পড়ে বলে, আমাকে ভয় দেখিয়ে এরূপ জবানবন্দী দিতে বাধ্য করা হয়েছে, আমার জীবনের মমতা আর নেই, আমি আত্মঘাতী হব। আমি মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে যা কিছু বলেছি

তা আব্দুর রহিম, ওয়ারিস উদ্দীন ও প্রেমদাস এই তিনজন খ্রিস্টানের প্ররোচনায় বলেছি। মির্যা সাহেব আমাকে পাঠান নি এবং আমার সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধই নেই। প্রথমদিন জবানবন্দী দিতে যেটুকু ত্রুটি হত পরের দিন তারা আমাকে শিখিয়ে দিত। মির্যা সাহেবের যে শিষ্যের নাম করে আমি বলেছিলাম যে, হত্যার পর তিনি আমাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছেন, আমি কোনদিন তাঁর চেহারাও দেখি নি। এরাই আমাকে তাঁর নাম ও ঠিকানা শিখিয়ে দিয়েছে। আমি যাতে তাঁর নাম ও ঠিকানা না ভুলে যাই সে জন্য আমার হাতের তালুতে পেনসিল দিয়ে লিখে দিয়েছে এবং বলেছে, সাক্ষ্য দেওয়ার সময় দেখে নিও। যখন মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে জবানবন্দী লেখা হয় তখন খ্রিস্টানগণ আনন্দে আটখানা হয়ে বলে "আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ এবার মির্যা সাহেবকে আমারা ফাঁসাবই)।"

এই সকল বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হযরত আহ্‌মদকে মুক্তি দেন। এ মোকদ্দমায় তাঁর শত্রুগণের কী উল্লাস! একজন আর্য সমাজের উকিল বিনা পয়সায় এই মোকদ্দমার তদ্বির করে। অনেক মুসলমান মৌলবিও এই মোকদ্দমায় তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এসেছিল। মোট কথা, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান একত্রিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে লেগেছিল। কিন্তু খোদাতা'লা কাপ্তান ডগ্‌লাসকে পীলাতের চাইতেও প্রচুর সৎসাহস দিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেক বারই বলেছেন "আমি বেঈমানি করতে পারব না"। এ কথা বলেন নি যে, আমি আমার হাত ধুয়ে নিয়ে মসীহ্ মাওউদকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। বরং তাঁকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে মুক্তি দিয়েছেন এবং রোমের শাসন হতে বৃটিশ শাসন যে উন্নত তা প্রমাণ করেছেন।

সুলেহ খায়েরের প্রস্তাব

এই সময়ে হযরত আহ্‌মদ মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'সুলেহ খায়ের' নামে একখানা বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করে মুসলমান আলেমগণের নিকটে প্রেরণ করেন এবং এই অনুরোধ করেন যে, তাঁরা যেন তাঁর বিরোধিতা হতে নিরস্ত থাকেন এবং তাঁকে বিধর্মীগণের সঙ্গে বোঝা-পড়া করার অবসর দেন। তিনি দশ বছরের সময় স্থির করে বলেন, "যদি আমি মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক হই তাহলে, এই সময়ের মধ্যে আমার বিনাশ আমার নিজ কর্মফলেই হবে। আর যদি আমার দাবি সত্য হয়, তাহলে সত্যের অবমাননা করলে আল্লাহ্‌তা'লার যে কোপানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠে তা হতে তোমরা কি পরিত্রাণ পাবে? কিন্তু মুসলমানগণ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। ইসলামের শত্রুগণের সম্মুখীন না হয়ে তারা তাঁর বিরুদ্ধেই দন্ডায়মান হয়।

মুলতান গমন

১৮৯৭ সনের অক্টোবর মাসে হযরত আহ্‌মদ (আ.)-কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মুলতান যেতে হয়। মুলতান হতে ফেরার পথে তিনি কয়েকদিন লাহোরে অবস্থান করেন। তিনি লাহোরের যে যে রাস্তায় গমন করতেন সেই স্থানের লোকেরা তাঁকে গালি দিত এবং উচ্চস্বরে তাঁর সম্বন্ধে নানা প্রকার অশ্লীল কথা বলত। তখন আমার* বয়স মাত্র আট বছর। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তাঁকে অপদস্ত করার কারণ না বুঝে আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম, এই সকল লোক কেন তাঁর পিছনে পিছনে হাততালি দেয় এবং শিষ দেয়? আমার মনে আছে, একটা হাত কাটা ব্যান্ডেজ বাঁধা লোক খুব সম্ভব উজীর খাঁর মসজিদের সিড়ির উপর ভীড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উল্লাসভরে কাটা হাতটা অপর হাতের উপর মারছিল আর সকলের সঙ্গে চীৎকার করছিল, "হায়, হায় মির্যা পালায়।" আমি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন

* লেখক হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)- অনুবাদক

হয়ে এই দৃশ্য দেখছিলাম। আমার দৃষ্টি বিশেষ করে এই হাত কাটা মানুষটির উপর ছিল। আমি গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বের করে ঐ লোকটিকে দেখছিলাম।

পঞ্জাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং হুযুর (আ.) এর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

লাহোর হতে হযরত সাহেব কাদিয়ানে ফিরে আসেন। এই বছর পঞ্জাবে প্লেগ দেখা দেয়। এই মহামারীর বেগ প্রশমিত করার জন্য গভর্ণমেন্ট যে সকল বিধি ও নিয়মের ব্যবস্থা করেন সকল ধর্মের লোকই তার বিরোধী হয়। হযরত আহ্‌মদ (আ.) গভর্ণমেন্টের পক্ষ সমর্থনপূর্বক গভর্ণমেন্টকে খুব সাহায্য করেন এবং তাঁর জামা'তকে উপদেশ দেন যে, সরকার হতে যে সকল বিধি-নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে দোষের কিছু নেই, বরং ইসলামের এই হুকুম যে, "স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে সকল বিধি-ব্যবস্থা হয় তা পালন করা সকলের কর্তব্য।" এই প্রকারে তিনি শান্তিরক্ষা কাজে সহায়তা করেন। তখন জনসাধারণের মনে ধারণা জন্মেছিল যে, গভর্ণমেন্টই ইচ্ছাপূর্বক এই সকল দেশে প্লেগ বিস্তার করছে এবং এর গতিরোধের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে তা বস্তুতঃপক্ষে প্লেগ বিস্তারের সহায়ক এবং এই সকল নিয়ম ইসলামের আদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন কি মুসলমান আলেমগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, প্লেগের সময় ঘর হতে বাইরে বের হওয়া ঘোর পাপ। এই ফতোয়ার ফলে হাজার হাজার লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ইঁদুর মারার ঔষধ বিতরণ করা হয়েছিল, কিন্তু এই ঔষধ হতে প্লেগ উৎপন্ন হয় বলে লোকের বিশ্বাস জন্মায়। ইদুঁর মারার পিঁজরা দেওয়া হয়, কিন্তু তার উপরও নানা প্রকার দোষারোপ করা হয়। মোট কথা, এই সময় জনসাধারণের মধ্যে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। স্থানে স্থানে সরকারী কর্মচারীদের উপর আক্রমণও হয়। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপদেশ ও তাঁর

জামা'তের কার্যাবলী দেখে জনসাধারণ যথেষ্ট শিক্ষা ও সান্ত্বনা লাভ করে। তিনি এই কথা বুঝিয়ে দেন যে, কোন মহামারীর সময় ঘর হতে বাইরে বের হওয়া কিম্বা পল্লী হতে বের হয়ে খোলামাঠে বাস করা ইসলাম বিরুদ্ধ নয়। বরং এক শহর হতে অন্য শহরে যাওয়া নিষেধ। কারণ তদ্দারা ঐ শহরেও রোগ বিস্তারের আশঙ্কা দেখা দেয়।

সিডিশন আইন

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এই সময়টা বড় সঙ্কটের সময় ছিল। কারণ ধর্ম সম্বন্ধীয় বিচার বিতর্ক অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সন উপরোক্ত কারণের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মসংশ্লিষ্ট শত্রুতা খুব বেড়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক দূর্নীতিগ্রস্তরা ধর্মীয় শত্রুতাকে হাতিয়ার করে সাধারণ মানুষকে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে থাকে। এই দুষ্টামিকে অনুভব করে গভর্ণমেন্ট ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'সিডিসন আইন' পাশ করে। কিন্তু এই আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুস্থানে ধীরে ধীরে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি বিস্তৃত হতে থাকে। এই আইন ততটা কার্যকারী হয় নি। ভারতবর্ষে ধর্মের যতটা প্রভাব এবং ধর্মের জন্য লোক যতটা উত্তেজিত হয় রাষ্ট্রীয় বা অন্য কোন কারণে ততটা হয় না। এই আইন দ্বারা ধর্ম সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদের প্রতিরোধ করা হয় নি এবং গভর্ণমেন্ট তা রোধ করারও কোন আবশ্যকতা উপলব্ধি করে নি। কিন্তু ভারতে অশান্তির যে মূল কারণ যা গভর্ণমেন্টের প্রধান প্রধান কর্মচারীবৃন্দ বুঝে উঠতে পারে নি, হযরত আহ্‌মদ তাঁহার নির্জ্জন গৃহকোণে থেকে তা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করছিলেন।

ধর্মীয় বিবাদ সম্পর্কিত মেমোরেন্ডাম

১৮৯৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একটি মেমোরেন্ডাম তদানীন্তন ভারতের লাট এঞ্জেল বাহাদুর ভাইসরয়ের সমীপে প্রেরণ করেন এবং তা ছাপিয়ে সর্বসাধারণে প্রচার করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক কলহের মূল কারণ ধর্মীয় মতভেদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই প্রকার সংঘর্ষে যে উত্তেজনা লোকের মনে জাগরিত হয় কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ তা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। সুতরাং তাঁর মতে সিডিসন আইনের মধ্যে ধর্মীয় উত্তেজনাকর বিবৃতির বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই বিষয়ের প্রতিকারের জন্য তিনি তিন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

প্রথমতঃ- এমন একটি আইন হওয়া চাই যদ্বারা প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় কেবল নিজ নিজ ধর্মমতের সৌন্দর্য বর্ণনা করবে, কিন্তু অন্য কোন ধর্মকে আক্রমণ করতে পারবে না। এই আইন দ্বারা ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ হবে না এবং বিশেষ কোন ধর্মমতের পক্ষ সমর্থনও করা হবে না এবং কেউ অন্য ধর্মকে আক্রমণের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল বলে আপত্তি করতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ- যদি উপরোক্ত প্রস্তাব গৃহীত না হয় তাহলে অন্ততঃপক্ষে যেন এতটুকু করা হয় যে, এক ধর্মের উপর এমন কোন বিষয়ে দোষারোপ না করে, যা তাদের নিজ ধর্মেও বিদ্যমান রয়েছে।

তৃতীয়তঃ- যদি এই প্রস্থাবও গৃহীত না হয়, তবে গভর্ণমেন্ট অন্ততঃ এটুকু করতে পারেন যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জেনে গভর্ণমেন্ট তাদের ধর্মের প্রাথমিক গ্রন্থগুলির এক তালিকা প্রস্তুত করুক এবং আইন পাস করুক যে, কোন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থের বাইরে যেন সমালোচনা না করা হয়। কেননা, কোন সমালোচক যদি নিজের মনগড়া দোষ কোন ধর্মের উপর আরোপ করে, যা সেই ধর্মের গ্রন্থে পাওয়া না যায়, অথবা

এমন সব বাজে গল্প কাহিনী সৃষ্টি করে যা উক্ত ধর্মাবলম্বীগণ সত্য জ্ঞান না করে, তাহলে ঐ সমালোচনা হতে নানা প্রকার বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

যদি গভর্ণমেন্ট তাঁর পরামর্শমত কাজ করত, তাহলে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল তা কখনও সম্ভবপর হত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গভর্ণমেন্ট সেই সময় এই প্রকার আইনের আবশ্যকতা বুঝতে পারে নি। সেই সময় এই ক্রমবর্ধমান অশান্তির অন্তরালে যে কারণ নিহিত ছিল তার প্রতি কোন সম্প্রদায়েরই চোখ খোলে নি। কিন্তু হযরত আহ্‌মদ স্বীয় দূরদৃষ্টির প্রভাবে তখনই তা দেখতে পেয়েছিলেন। পূর্ণ দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর গভর্ণমেন্টকে ১৯০৮ সনে বাধ্য হয়ে এই আইন পাশ করতে হয় যে, কোন ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মকে অন্যায় আক্রমণ অথবা অযথা অপবাদ দিতে পারবে না। যদি কেউ এরূপ করে তাহলে গভর্ণমেন্ট সেই সকল প্যামফ্লেট, পুস্তক বা সংবাদপত্র এবং তৎসংশ্লিষ্ট ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করবেন। কিন্তু এই আইন অত্যন্ত বিলম্বে পাশ হওয়ায় ফল সন্তোষজনক হয় নি।

একথা নিশ্চিত যে, এই দেশে যত অশান্তির প্রাদুর্ভাব হয়েছে তার মূল কারণ ধর্মসংক্রান্ত বিবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই বিবাদ হতে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তাই সুচতুর কুচক্রিগণ নিপুনতার সঙ্গে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে। ভারতবাসীর নিকট তাদের ধর্ম অতীব প্রিয় সামগ্রী। যদি কেউ কারও ধর্মকে কুৎসিত কদর্য ভাষায় আক্রমণ করে তাহলে অশিক্ষিত জনসাধারণকে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার কারণ কেবল এতটুকু বললেই যথেষ্ট হয় যে, 'গভর্ণমেন্টেরই সকল দোষ। গভর্ণমেন্টের আশ্রয় না পেলে তার শাসনাধীনে থেকে এই সকল ধর্মবিদ্বেষীরা আমাদের মনে কষ্ট দিতে কখনই সাহস করত না।' এরূপ উক্তির ফলে অজ্ঞ লোকের আক্রোশ অত্যাচারীর উপর না পড়ে সদাশয় গভর্ণমেন্টের উপরই পতিত হয়।

একটি মর্মঘাতী পুস্তক

১৮৯৮ সনে একজন ইসলাম ধর্মত্যাগী খ্রিস্টান হযরত রসূলে করিম (সা.) এর পুণ্যবতী সহধর্মণীগণের বিরুদ্ধে একখানি বিদ্বেষপূর্ণ এবং মর্ম-পীড়াদায়ক পুস্তক* প্রকাশ করে। এর ফলে মুসলমান সমাজে ঘোর আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দেখলেন, এই আন্দোলনের বিষময় ফলে দেশে অশান্তির সৃষ্টি হবে। লাহোরে একটি আঞ্জুমান** গভর্ণমেন্টের নিকট এ পুস্তক বাজেয়াপ্ত করবার প্রার্থনা করে একখানা মেমোরেন্ডাম পেশ করেন। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব বলেন যে, এটি ফলপ্রসু হবে না। তিনি পরামর্শ দিলেন, এ মেমোরেন্ডামের পরিবর্তে এই পুস্তকের একটি যুক্তিপূর্ণ জবাব দেওয়া হোক। কিন্তু আঞ্জুমান তাঁর পরামর্শের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। পরিশেষে, হযরত আহ্‌মদ যা বলেছিলেন তাই হল; অকৃতকার্য হতে হল। তিনি এই মেমোরেন্ডাম প্রেরণ সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ করেন, কেননা মেমোরেন্ডাম অনুযায়ী কাজ করা হলে তদ্বারা ইসলামের দুর্বলতা প্রকাশ পেত। তিনি প্রথমে উক্ত পুস্তকের জবাব দান করাই সর্ব প্রধান কাজ বলে মনে করেন এবং সে মতে জবাব দানের পর এ বিষয়ে মেমোরেন্ডামের*** মাধ্যমে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরূপ তিনি ইসলামের প্রচার বিরোধী

* এই মর্ম পীড়াদায়ক পুস্তক " উম্মাহাতুল মু'মিনীন" ডা. আহ্‌মদ শাহ্ নামক এক খ্রিস্টান ব্যক্তি রচনা করেছিল।

** লাহোরের আঞ্জুমান বলতে "আঞ্জুমান হিমায়াতে ইসলাম লাহোর" বোঝায়।

*** ৪'ঠা মে ১৮৯৮ সনে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.) পঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর এর নিকট এই মেমোরেন্ডাম প্রেরণ করেন যে, উক্ত পুস্তকের হাজার কপি ছাপিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করে তাদের মর্ম পীড়ার কারণ হয়েছে। সেহেতু কেবল এই পুস্তককে বাজেয়াপ্ত করলে চলবে না। বরং পাদ্রীগণ এরূপ হাজার হাজার পুস্তক রচনা করে মুসলমানদের হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছে। এই তর্কযুদ্ধের পদ্ধতির সংশোধন হওয়া দরকার এবং এরূপ হৃদয় বিদারক ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইনানুগ নিষেধাজ্ঞা জারী করা প্রয়োজন।

এবং ইসলাম-বিদ্বেষী লেখকগণের আক্রমণের প্রতিবাদ করবার ন্যায় অধিকার যে মুসলমানদেরও আছে তা তিনি স্থাপন করেন।

জামা'তের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও বিরুদ্ধবাদীদের অসফলতা

এই বছর হযরত আহ্‌মদ তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের ভিত্তি সুদৃঢ় করার এবং তার বিশেষত্বগুলি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জামা'তের বিবাহাদি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির সুব্যবস্থা করার দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি আহ্‌মদীগণকে তাদের মেয়েদেরকে জামা'তের বাইরে বিবাহ দিতে নিষেধ করেন।

এই বছরে তিনি গভর্ণমেন্টকেও তাঁর আবির্ভাবের আনুসাঙ্গিক লক্ষণাদি সম্পর্কে বিচার করে দেখার জন্য আহ্বান করেন। যদ্বারা সরকারি আমলাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যা উত্তমরূপে সাধিত হয়।

১৮৯১ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জামা'তের বালকদের শিক্ষার জন্য কাদিয়ানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, যেন জামা'তের ছাত্রগণ চতুর্দিক হতে এসে এক জায়গায় শিক্ষা লাভ করে এবং অন্যান্য স্কুলের অধর্মীয় প্রভাব হতে রক্ষা পেতে পারে। প্রথম বছর এই স্কুলে প্রাইমারী ক্লাস পর্যন্ত খোলা হয়। পরবর্তীতে প্রতি বছর উন্নতি করতে করতে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুলের ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়।

১৮৯৯ সনে তাঁর শত্রুগণ তাঁর বিরুদ্ধে এক শান্তি রক্ষা সম্পর্কিত মোকদ্দমা দায়ের করে, কিন্তু তারা এই মোকদ্দমায় চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অকৃতকার্য হয় এবং তিনি বিজয়ী হন।

লর্ড বিশপকে মীমাংসার আহ্বান

১৯০০ সনে তিনি খ্রিস্ট ধর্মের অসারতা সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপন্ন করার জন্য আরও এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি লাহোরের বিশপকে খোদায়ী ফয়সালার জন্য আহ্বান করেন। দেশের খ্যাতনামা পত্রিকাসমূহের অনুরোধ সত্ত্বেও লর্ড বিশপ এই প্রকারের ঐশী মীমাংসায় তাঁর সম্মুখীন হতে সাহস করেন নি।

জামা'তের নামকরণ

১৯০১ সনে যে আদমশুমারি হয় তার পূর্বে তিনি তাঁর জামা'তে এই আদেশ প্রচার করেন যে, এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই যেন গণনার সময় নিজেকে আহ্‌মদী মুসলমান বলে লেখেন। এই সময় হতে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তকে **'আহ্‌মদী'** নামে আখ্যায়িত করে অন্যান্য সাধারণ মুসলমান হতে স্বতন্ত্র করেন।

আত্মীয়-স্বজনের উৎপীড়ন

এই সময় তাঁর বিরুদ্ধবাদী আত্মীয়-স্বজন তাঁর অনুগামীদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ির মসজিদের দরজার সামনে এক প্রাচীর তুলে দেয়। এর ফলে নামাযিগণকে অনেকটা ঘুরে মসজিদে আসতে হত। এই অসুবিধা ও কষ্ট দূরীকরণের জন্য ১৯০১ সনের জুলাই মাসে হযরত আহ্‌মদ তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করতে বাধ্য হন। ঐ বছরই আগস্ট মাসে উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। উক্ত প্রাচীর ভেঙ্গে দেওয়া হয়। মোকদ্দমার খরচও তাদের উপর ডিক্রি হয়। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

রিভিউ অফ রিলিজিয়ানস্

১৯০২ সনে হযরত আহ্‌মদ পাশ্চাত্য জগতে ইসলাম প্রচারের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের আদেশ দেন। এই পত্রিকার নাম 'রিভিউ অফ রিলিজিয়ানস্' রাখা হয়। খোদার ফজলে এটি এখনও চালু আছে। এর এক সংস্করণ ইংরেজীতে আর এক সংস্করণ উর্দুতে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই পত্রিকার সাহায্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় অতি সহজে ইসলাম প্রচার হচ্ছে। এর জবরদস্ত রচনাবলী শত্রু-মিত্র সকলকেই মুগ্ধ করছে। প্রাথমিক অবস্থায় জামা'তের অন্যান্য লেখক ছাড়াও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং এখানে প্রবন্ধ লিখতেন। তা প্রথমে উর্দুতে লেখা হত এবং পরে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হত। এই সকল প্রবন্ধ পাঠকদের উপর এত গভীর প্রভাব পড়েছিল যে, পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার প্রথম বছরেই এটি একটি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

খোতবায়ে ইলহামিয়া

এই বছর ঈদ-উল-আজহা (যা হজ্বের পরের দিন হয়ে থাকে) উপলক্ষে তিনি খোদাতা'লার ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে আরবি ভাষায় অবলীলায় এক বক্তৃতা করেন। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। তাঁর উপরে এক আশ্চর্য্য ভাবের শোভা প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁর মুখ মন্ডল রক্তিম হয়ে উঠছিল এবং চেহারা হতে স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছিল। তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হত যেন এক অপূর্বভাবে তিনি নিমজ্জিত রয়েছেন। তাঁর মুখ হতে বাক্য নির্গত হচ্ছিল তা এমন সুন্দর ও অনুপম যে অতি বিচক্ষণ আরবি ভাষাবিদগণও তা অতুলনীয় বলে স্বীকার করেছেন। বক্তৃতার মধ্যে এত গুঢ় পরমার্থ তত্ব নিহিত ছিল যে, ভাবলে মানুষকে হতবুদ্ধি হতে হয়। এই বক্তৃতা "খোতবায়ে ইলহামিয়া" নামে প্রকাশিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ আরবি ভাষায় বিবৃত।

জামা'তে আরবি শিক্ষার উৎসাহ দান

ঐ বছর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জামা'ত যাতে সহজে আরবি ভাষা শিখতে পারে এই উদ্দেশ্যে এক অতি সুন্দর উপায় নির্ধারণ করেন। তিনি অতি সহজে সরল ভাষায় কতকগুলি আরবি পুস্তক লেখার প্রস্তাব করেন যেন সকলে তা মুখে মুখে আয়ত্ত করতে পারে। এইরূপে জামা'তে ধীরে ধীরে আরবি ভাষার জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই সকল প্রাথমিক পুস্তকে মানুষের দৈনন্দিন কাজ ও সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য যে সকল বাক্য প্রত্যহ ব্যবহৃত হয় তাই লিপিবদ্ধ হবে। এই প্রণালী অবলম্বনে কয়েকটি পাঠ লেখার পর অন্য কতকগুলি অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজের চাপে এই কল্যাণকর কাজটি স্থগিত রাখতে হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ইচ্ছা ছিল যে মাতৃভাষার সঙ্গে যেন প্রত্যেক মুসলমান নরনারী আরবি শিখতে পারে এবং ভাবী বংশধরগণের পক্ষে আরবি সহজসাধ্য হয়। মুসলমানগণ শিশুকাল হতে মাতৃভাষার ন্যায় আরবি ভাষাও সহজে লিখতে পড়তে পারলে ভারতে ইসলাম সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সমর্থ হবে। যে ব্যক্তি আপন ধর্মের ভাষা জানে না সে কখনও ধর্মের বিষয় ভালরূপে জ্ঞাত হতে পারে না। যে সমাজ স্বীয় ধর্ম সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ নয়, সে সমাজ কখনও বাইরের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয় না। অধিকন্তু, যে সমাজকে ধর্ম শিক্ষার্থে শুধু অনুবাদের উপর নির্ভর করতে হয়, সে সমাজ না ধর্ম লাভ করতে পারে, না তার ধর্ম-পুস্তক স্থায়ী হতে পারে। অনুবাদ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে মূল গ্রন্থ পাঠের প্রবৃত্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। অথচ অনুবাদ কখনও মূল গ্রন্থের সমতূল্য হতে পারে না। সুতরাং সেই সমাজ অবশেষে আপন প্রকৃত স্থান রক্ষা করতে না পেরে বহু দূরে সরে পড়ে। তাঁর এই সাধ সংকল্পের বিষয় তাঁর জামা'তের অন্তরে জাগরুক রয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য হলে একদিন তা কার্যে পরিণত হবে।

মিনারের ভিত্তি স্থাপন

এই বছর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক বিশেষ কাজ করেন। হাদীস শরীফে এক ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, 'প্রতিশ্রুত মসীহ্ দামেস্কের পূর্বদিকে এক শ্বেতবর্ণ মিনারের উপর অবতীর্ণ হবেন'। ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করার বাসনায় তিনি এক মিনারের ভিত্তি স্থাপন করেন। অবশ্য এর তা'বির বা প্রকৃত অর্থ হল, মসীহ্ মাওউদ পরিস্কার নিদর্শন ও সহজবোধ্য যুক্তি-প্রমাণসহকারে ধরাধামে আগমন করবেন। সমগ্র বিশ্বে তাঁর গৌরব বিজয় প্রকাশিত হবে। কারণ ইলমে তা'বিরুর রো'য়া (অর্থাৎ স্বপ্নের ফলাফল নির্ণয় বিদ্যা) অনুসারে মিনারের উপর অবতরণ করবার অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করবেন যার সারবত্তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না এবং এরূপ সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হবে যা কারও দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না। পূর্বদিকে আগমন করার অর্থ এরূপ উন্নতি বোঝায়, যাকে কেউই বাধা প্রদান করতে পারে না।

সাধনার সফলতা

ঝিলাম যাত্রা

১৯০২ সনের শেষভাগে করমদিন নামক এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নামে এক মানহানি মামলা রজু করে। ঝিলামের ফৌজদারী আদালতে তাঁকে তলব করা হয়। সেহেতু ১৯০৩ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি সেখানে গমন করেন। এই ভ্রমণ হতেই তাঁর কাজের সফলতা আরম্ভ হয়। যদিও তিনি মোকদ্দমার জবাব দিতে গিয়েছিলেন, তথাপি তাঁকে দেখার জন্য লোক দলে দলে আসতে লাগল। যখন তিনি ঝিলাম স্টেশনে অবতরণ করেন, তখন স্টেশনে লোক ধরে না। দাঁড়াবার তিল পরিমাণ জায়গাও ছিল না। কেবল স্টেশনের ভিতরে রাস্তার দুই ধারে এত লোকের ভিড় ছিল যে, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ ছিল। অবশেষে বাধ্য হয়ে

জেলার অফিসারদেরকে লোক চলাচলের বিশেষ বন্দোবস্ত করতে হয়। গোলাম হায়দার সাহেব তহশিলদার (সাব ডেপুটি কালেক্টর) এই কাজের জন্য নিয়োজিত হন। তিনি হযরত মির্যা সাহেবকে গাড়িতে নিয়ে কষ্টে রাস্তা পরিষ্কার করে নিয়ে যান। শহর পর্যন্ত জনতার ভিড় একই রকম। বের হওয়ার পথ পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। শহরের লোক ছাড়া হাজার হাজার গ্রামবাসীও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সুদূর পল্লী হতে আগমন করেছিল। এই স্থানে প্রায় এক হাজার লোক তাঁর হাতে বয়া'ত (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করেন। যখন তিনি আদালত চত্বরে উপস্থিত হন, তখন সেখানে এত ভিড় ছিল যে, সেখানে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে। আদালত চত্বরের বাইরে বহুদূর ময়দান পর্যন্ত জনতা বিস্তৃত ছিল। প্রথম শুনানীর দিনই তাঁকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয় এবং তিনি নিরাপদে ফিরে যান।

জামা'তের বিস্তার

১৯০৩ সন হতে তাঁর কাজের সফলতা আশ্চর্যরূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোন কোন দিন (এক দিনেই) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য ৫/৬ শত আবেদন পত্র আসত। দেখতে দেখতে তাঁর শিষ্যগনের সংখ্যা হাজার হতে লক্ষে পৌঁছে গেল। প্রত্যেক স্তরের লোক তাঁর জামা'তভুক্ত হতে লাগল এবং তাঁর হাতে বয়া'ত (দীক্ষা) গ্রহণ করল। এইরূপে জামা'ত অতি দ্রুতবেগে বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং দেখতে দেখতে পঞ্জাবের সীমা অতিক্রম করে অন্যান্য রাজ্যে প্রবেশ করল এবং অবশেষে ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হল। কিন্তু এই বছর আহ্‌মদীয়া জামা'তের পক্ষে একটা নিদারুণ মর্মান্তিক ঘটনাও সংঘটিত হল। আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলে এই জামা'তের একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে * কেবল মাত্র ধর্মীয় মতভেদের কারণে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়।

* শহীদ মরহুম হযরত আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)- অনুবাদক

শত্রুদের চক্রান্ত ও বৃটিশ বিচার

অতঃপর হযরত আহ্‌মদের বিরুদ্ধে চারদিক হতে নানা প্রকার মোকদ্দমা উত্থাপিত হতে লাগল। ঝিলামে এর সূত্রপাত হয়ে কিছুকালের জন্য স্থগিত হয়। আবার দ্বিগুণ বেগে বিরুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। যে করমদিন ঝিলামের মোকদ্দমায় পরাস্ত হয়, সে গুরদাসপুর জেলায় পুনরায় সেই মানহানি মোকদ্দমা উপস্থাপন করে। এই মোকদ্দমা অনেক দিন ধরে চলতে থাকে। এত দীর্ঘকাল এই মোকদ্দমা স্থায়ী থাকে যে, একজন ম্যাজিস্ট্রেট ইতিমধ্যে বদলি হয়ে যায়। এত শীঘ্র শীঘ্র মোকদ্দমার তারিখ পড়তে থাকে যে, হযরত মির্যা সাহেবকে বাধ্য হয়ে গুরদাসপুর শহরে বাস করার বন্দোবস্ত করতে হয়।

মোকদ্দমার বিষয় কিন্তু মাত্র তিন-চারটি শব্দের অর্থ নিয়ে। উক্ত করমদিন তাঁর সম্বন্ধে একটি মিথ্যা কথা বলেছিল। তিনি তাঁর কোনও পুস্তকে তাকে 'কায্‌যাব' বলেছেন। ঐ শব্দ আরবি ভাষায় 'মিথ্যাবাদী' ও 'ঘোর মিথ্যাবাদী' এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরূপ আর একটি শব্দ 'লয়ীম' যার আসল অর্থ ছোটলোক। কিন্তু এটি জারজ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। করমদিনের নালিশ এই ছিল যে, তাকে ঘোর মিথ্যাবাদী ও জারজ বলে অপমানিত করা হয়েছে। এই দুই শব্দের প্রকৃত অর্থ নিয়ে নানা প্রকার অনুসন্ধান আরম্ভ হল। এর ফলে এত রকমের জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে এবং এই নিয়ে এত বিতর্ক চলে যে, দুই বছরে এই মোকদ্দমা শেষ হয়। মোকদ্দমার শুনানিকালে এক ম্যাজিস্ট্রেট সম্বন্ধে এরূপ জনরবও ওঠে যে, ম্যাজিস্ট্রেটের স্বধর্মাবলম্বীগণ তাঁকে বলে কয়ে এইবার মির্যা সাহেবকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবে। একদিনের জন্য হলেও কারাদণ্ড অবশ্য দেবে। শত্রুগণ বলতে থাকে, এবার মির্যা সাহেব খুব ফাঁদে পড়েছেন। তাঁর শুভাকাঙ্খী সকলেই এই জনরব শুনে অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁর নিকটে এসে নিবেদন করলেন, 'হুযুর আমরা এইরূপ জনরব শুনে আসছি'।

তখন তিনি শায়িত অবস্থায় ছিলেন। এই কথা শুনে তাঁর চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করল। এক হাতের উপর ভর দিয়ে একটু উঠে বসলেন। তারপর উচ্চস্বরে বলেন "কি, এই ব্যক্তি খোদাতা'লার সিংহের গায়ে হাত তুলতে চায়? যদি তাই করে, তবে দেখতে পাবে এর ফল কি দাঁড়ায়"। এই জনরব সত্য কি মিথ্যা জানা যায় নি, কিন্তু ঐ ম্যাজিস্ট্রেটকে অল্পদিনের মধ্যেই ঐ স্থান হতে বদলি করা হয়। তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার ফৌজদারী ক্ষমতা উঠিয়ে নেওয়া হয়। কিছুকাল পরে তার বেতনও কমিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর উক্ত মোকদ্দমা আর একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে পেশ করা হয়। কিন্তু ঐ ম্যাজিস্ট্রেটও কোনও এক অনির্দিষ্ট কারণে মোকদ্দমা দীর্ঘ করতে থাকে। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কোর্টে মির্যা সাহেব বসার আসন পেতেন কিন্তু এই ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে পীড়িত থাকা সত্ত্বেও বসতে দেয় নি। সময় সময় তিনি জল পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেও তাঁকে জল পান করতে দেওয়া হয় নি। অবশেষে বহু কাল শুনানীর পর তাঁকে ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়। তারপর অমৃতসরে সেশন জজ মি. হেরীর নিকট এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। তিনি একজন ইউরোপীয়ান ছিলেন। তিনি নথি পরীক্ষা করে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এই সামান্য মোকদ্দমাকে ম্যাজিস্ট্রেট এত দীর্ঘ করলেন কেন? যদি এই মোকদ্দমা আমার নিকট আসত, তাহলে আমি একদিনেই তা খারিজ করে দিতাম। করমদিনের মত লোক সম্বন্ধে মির্যা সাহেব যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি যদি আরও কর্কশ শব্দ ব্যবহার করতেন তাহলেও ঠিক হত; এই প্রকারের মীমাংসা (রায়) অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। জজ সাহেব দুই ঘন্টার মধ্যেই তাঁকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে রায় প্রকাশ করেন। তাঁর উপর যে জরিমানা হয়েছিল তা মকুব করে দেওয়া হয়। এভাবে দ্বিতীয় বার আর একজন ইউরোপীয়ান বিচারক তাঁর কার্য দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা সেই জাতিকেই শাসনভার দেন যাকে তিনি উপযুক্ত মনে করেন।

এই মোকদ্দমা ১৯০৫ সনের জানুয়ারী মাসে শেষ হয়। মোকদ্দমা প্রারম্ভের কয়েক বছর পূর্বেই এই মোকদ্দমা এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে তাঁর নিকট আল্লাহ্‌তা'লা যে ওহী বা ঐশী বাণী প্রেরণ করেছিলেন তা এতদিনে পূর্ণ হয়।

লাহোর যাত্রা

মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় সকল ঘটনা একত্রে সমাবেশ করার উদ্দেশ্যে হযরত সাহেবের দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সফর বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয় নি। প্রথম হচ্ছে লাহোর সফর। মোকদ্দমার শুনানীর সময় ১৯০৪ সনের আগস্ট মাসে হযরত সাহেব সেখানে গমন করেন। তিনি পনের দিন লাহোরে ছিলেন। তাঁকে দেখবার জন্য বহু লোকের সমাগম হয়। ষ্টেশনে এত লোক হয় যে তিল ঠাঁই জায়গা ছিল না। শহরে হুলস্থুল পড়ে যায়। নিরূপিত বাসস্থানের চতুর্দিক হতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য থাকত। বিপক্ষগণ চিৎকার করে গালি দিত ও গোলমাল করত। কতকগুলি দুষ্ট লোক বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদেরকে বলপূর্বক বাইরে বের করে দেওয়া হয়। বন্ধুগণের অনুরোধে তাঁর এক রচনা পাঠের বন্দোবস্ত করা হয় এবং বিজ্ঞাপনও বিতরণ করা হয়। লাহোরের এক সুবৃহৎ হলে মৌলবি আব্দুল করীম (রা.) উক্ত বক্তৃতা পাঠ করেন। সমবেত লোকসংখ্যা সাত আট হাজারের কম হবে না। বক্তৃতা পাঠ শেষ হলে উপস্থিত সকলে তাঁকে কিছু বলতে অনুরোধ করে। তখন তিনি দাঁড়িয়ে আধ ঘন্টা পর্যন্ত একটা ছোট বক্তৃতা প্রদান করেন। এইরূপ দেখা গিয়েছে যে, তিনি যেখানেই যেতেন সকল ধর্মের লোকই তাঁর বিরুদ্ধে অতিশয় উত্তেজিত হয়ে উঠত; মুসলমানদের তো কথাই ছিলনা। এই জন্য পুলিশের কর্মচারীগণ এই সভায় শান্তি রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করেছিলেন। দেশীয় পুলিশ ব্যতীত ইংরেজ সিপাহীদেরকেও উন্মুক্ত তরবারি হাতে অল্প দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকার

ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুলিশ অফিসারগণ জানতে পেরেছিলেন যে, কতকগুলি মুর্খলোক সভার বাইরে অশান্তি ও উপদ্রব ঘটাবার চেষ্টা করবে। এজন্য হযরত মির্যা সাহেবের ফেরার সময় কয়েকজন অশ্বারোহী পুলিশ তাঁর গাড়ির সম্মুখে চলতে থাকে। গাড়ির পশ্চাতে পদাতিক পুলিশ এবং তার পিছনে অশ্বারোহী পুলিশ চলতে থাকে। এরূপে অত্যন্ত নিরাপদে তাঁকে গৃহে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং ষড়যন্ত্রকারীগণ তাদের দূরাভিসন্ধি করতে অসমর্থ হয়। এর পর তিনি গুরদাসপুরে ফিরে আসেন। ১৯০৪ সনের অক্টোবর মাসে গুরদাসপুরের মোকদ্দমায় কিছু অবকাশ পেয়ে তিনি কাদিয়ানে প্রত্যাগমন করেন।

২৭ শে অক্টোবর হযরত মির্যা সাহেব শিয়ালকোটে গমন করেন। সেখানকার বন্ধুবর্গ তাঁকে বার বার অনুরোধ করে বলেন যে, আপনি প্রথম জীবনে কয়েক বছর এখানে অতিবাহিত করেছেন। এখন যখন আল্লাহ্‌তা'লা আপনাকে এমন অত্যাশ্চর্য গৌরবময় সফলতা প্রদান করেছেন, তখন আপনি অনুগ্রহ করে এই স্থানকে আপনার পদধূলি দ্বারা পবিত্র করে যান। এই সফরও তাঁর অভাবনীয় সফলতা লাভের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রত্যেক ষ্টেশনে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য এত লোকের ভিড় হত যে, ষ্টেশনের কর্মচারীবৃন্দ শৃঙ্খলা রক্ষা করতে অপারগ হয়ে পড়ত। লাহোর ষ্টেশনে এত লোকের সমাগম হয়েছিল যে, প্লাটফর্ম টিকিট শেষ হয়ে যায়। সুতরাং স্টেশন মাস্টার সকলকেই ভিতরে প্রবেশ করতে অনুমতি দেন। যখন তিনি শিয়ালকোটে পৌঁছান তখন দেখা গেল স্টেশন হতে তাঁর থাকার জায়গা পর্যন্ত এক মাইল ব্যাপী এক জনসমুদ্র। সন্ধ্যার সময় ট্রেন স্টেশনে থামল। ঘোড়ার গাড়িতে আরোহণ করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। কিছু দূর অগ্রসর হতেই চারদিক অন্ধকারময় হয়ে পড়ে। তখন ভয় হতে লাগল, লোকের যেরকম ভীড় এবং অন্ধকার যেরূপ গভীর তাতে গাড়ির নীচে পড়ে কেউ প্রাণ না হারায়। এজন্য পুলিশ বন্দোবস্ত করল যেন তাঁর সম্মুখের রাস্তা পরিস্কার থাকে। শিয়ালকোটের একজন ভদ্রলোক

সেখানকার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তিনিও পুলিশের সহায়তা করতে লাগলেন। তাঁরা অতিকষ্টে ভীড়ের মাঝখান দিয়ে গাড়ির জন্য রাস্তা বের করছিলেন। গাড়িও অতি ধীর গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। গাড়ির জানালা দরজা খোলা ছিল। রাস্তার দুই ধারে লোক সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গৃহের বারান্দাগুলিতেও লোকে পরিপূর্ণ ছিল। অনেকে স্থানাভাবে জানালার উপর উঠে বসেছিল। গৃহের ছাদের উপর হিন্দু মুসলমান সকলে তাঁকে দেখার জন্য ল্যাম্প, মশাল প্রভৃতি জ্বালিয়ে রেখেছিল। ছাদগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের ভরে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। হযরত মির্যা সাহেবের গাড়ি নিকটবর্তী হলেই তারা মশালগুলি সম্মুখে ধরে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করত। কেউ কেউ পুষ্পমালাও নিক্ষেপ করছিলেন।

লেকচার শিয়ালকোট

তিনি পাঁচদিন শিয়ালকোটে ছিলেন। যারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসত তিনি তাদেরকে ধর্মোপদেশ দান করতেন। একটি পাবলিক লেকচারেরও বন্দোবস্ত হয়। এই সংবাদ পেয়ে মৌলবিগণ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেন, কেউ যেন মির্যা সাহেবের লেকচার শুনতে না যায়। তাঁরা ফতোয়া জারী করে যে, যে ব্যক্তি উক্ত লেকচার শুনতে যাবে স্ত্রীর সঙ্গে তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এই প্রকার ফতোয়া তখনকার আলেমগণের হাতে অস্ত্র স্বরূপ ছিল যার বলে তাঁরা নিরক্ষর মুসলমানদের উপর স্বীয় প্রভাব অক্ষুন্ন রাখত। এই প্রকার ফতোয়া জারীর কোন দলীল তাঁদের নিকট ছিল না। তারা এই ঘোষণা জারী করেও স্থির থাকতে পারল না। কতিপয় বিরোধী মৌলবি যে স্থানে সভা হওয়া স্থির হয়েছিল, তার সামনে এক স্থানে লেকচার দেবে বলে ঠিক করে যেন জনগণ মির্যা সাহেবের লেকচার প্রাঙ্গনে প্রবেশ না করতে পারে। সভা প্রাঙ্গনের সম্মুখে প্রবেশদ্বারে কতকগুলি লোক নিযুক্ত করে যেন প্রবেশাকাঙ্খী ব্যক্তিগণকে বুঝিয়ে বলে যে, এই সভায় যোগদান করা গুনাহ্‌র কাজ। কেউ কেউ এতদূর

পর্যন্ত গিয়েছিল যে, আগন্তুককে বলপূর্বক ধরে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যেত। তথাপি বহুলোক সভাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল। যখন হযরত মির্যা সাহেব সভাস্থলে আসলেন, তখন উক্ত মৌলবিদের লেকচার পরিত্যাগ করে সকলেই এই সভায় যোগদান করে। লোক এত আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শুনছিল যে অনেক সরকারী কর্মচারী অফিস খোলা থাকা সত্ত্বেও সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বক্তৃতা ছাপানো হয়েছিল। মৌলবি আব্দুল করীমের বক্তৃতা পাঠকালে গোলমালের সূত্রপাত হয়। কিন্তু ইংরেজ পুলিশ অফিসারের সাবধানতায় তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই অফিসার একটি সুন্দর কথা বলেন। তিনি মুসলমানগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা মুসলমান, তোমরা তাঁর বক্তৃতার কথা শুনলে এত বিচলিত হও কেন? তিনি তো তোমাদেরই সমর্থন করছেন, তোমাদেরই পয়গম্বরের গৌরব বর্ণনা করছেন। তাঁর কাজে নারাজ হওয়ার অধিকারী আমরা, কারণ তিনি অতি জোরের সঙ্গে আমাদের খোদার (যীশুর) মৃত্যুর প্রমাণ উপস্থিত করছেন। যাইহোক, পুলিশ কর্মচারীর সাবধানতায় কোন গোলমাল হতে পারে নি। এই বক্তৃতার এক প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি হিন্দুদের নিকট স্বীয় সত্যতা সম্যকরূপে প্রতিপন্ন করার জন্য এখানেই প্রথম সর্ব সাধারণ সমক্ষে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ (আ.) এর সমতুল্য বলে ঘোষণা করেন। বক্তৃতার পর গৃহে প্রত্যাগমনকালে কতকগুলি লোক তাঁর উপর পাথর ছোঁড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের চেষ্টা বিফল হয়। দ্বিতীয় দিনও এই রকম পুলিশের বন্দোবস্ত হওয়াতে তিনি নিরাপদে কাদিয়ানে ফিরে আসেন। যখন দুষ্ট লোকেরা দেখল যে, তারা কোন প্রকার নির্যাতন করতে পারে নি, তখন অনেক লোক শহরের বাইরে রেল পথের দুইধারে সমবেত হয়। যখন গাড়ি চলতে লাগে তখন তারা তাঁর কামরার দিকে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে। কিন্তু কয়েকটি কাঁচের জানালা ভাঙ্গা ছাড়া আর কিছুই ক্ষতি করতে পারে নি।

মৌলবি আব্দুল করীম সাহেব (রা.) এর দেহাবসান এবং দিল্লী যাত্রা

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১১'ই অক্টোবর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রিয় শিষ্য মৌলবি আব্দুল করীম, যিনি অনেক সভায় তাঁর বক্তৃতাগুলি পাঠ করে শোনাতেন, দীর্ঘকাল রোগ শয্যায় শায়িত থেকে অবশেষে মৃত্যু মুখে পতিত হন। এই ঘটনার পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাদিয়ানে একটি আরবি মাদ্রাসা স্থাপনের আদেশ করেন, যেন ইসলাম ধর্মে সুশিক্ষিত নব নব আলেমগণ দ্বারা পরলোকগত আলেমদের শূণ্যস্থান সর্বদা পূর্ণ হতে পারে। মৌলবি আব্দুল করীম সাহেবের মৃত্যুর পর হযরত আহ্‌মদ (আ.) দিল্লী গমন করেন। সেখানে প্রায় পনের দিন অতিবাহিত করেন। এবার দিল্লী নগর ষোল বছর আগের মত ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে শোরগোল সৃষ্টি করে নি। কিন্তু তাঁর প্রত্যাগমনের পর খুব গোলমাল হতে থাকে। এই পনের দিনের মধ্যে তিনি একবারও সাধারণ সভায় বক্তৃতা দেন নি। কিন্তু তাঁর বাড়িতে প্রায় প্রতি দিনই লেকচার হত। স্থান সংকীর্ণ ছিল বলে সেই বাড়িতে দুই-আড়াই শতের বেশী লোক সমবেত হতে পারত না। দু-একদিন কিছু গোলমালও হয়েছিল। একদিন তাঁকে আক্রমণের চেষ্টাও হয়েছিল। তথাপি প্রথমবারের তুলনায় এবারের উত্তেজনা কিছুই নয়। এই সফর হতে প্রত্যাগমনের সময় লুধিয়ানার জামাত তাঁকে দুই দিনের জন্য সেখানে রাখে। সেখানে তাঁর এক পাবলিক লেকচার হয়। লেকচার খুব সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ইতিমধ্যে অমৃতসর হতে তাঁর নিকট এক ডেপুটেশন যায় এবং তাঁকে দু-এক দিনের জন্য অমৃতসর অবস্থান করার জন্য প্রার্থনা করে। হযরত সাহেব তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। সেখানে তাঁর এক পাবলিক লেকচারের বন্দোবস্ত হয়। অমৃতসর আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের শত্রুগণের একটা আড্ডা, সেখানে মৌলবিগণের বড়ই প্রতিপত্তি ছিল। সেই সকল মৌলবির প্ররোচনায় জনসাধারণ ক্ষেপে ওঠে। সভার দিন

বিপক্ষগণ স্থির করে যে, কিছুতেই সভা হতে দেবে না। যখন হযরত আহ্‌মদ (আ.) সভাস্থলে আগমন করেন তখন দেখা গেল উক্ত মৌলবিরাই তাঁর বিরুদ্ধে ওয়াজ করছে। শ্রোতাগণের অনেকের জামার আস্তিন প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব ভিতরে প্রবেশ করে তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করে দেন। মৌলবিগণ তাঁর বক্তৃতার প্রতিবাদ করার সুবিধা না পেয়ে লোকসকলকে উত্তেজিত করতে লাগল। প্রায় পনের মিনিট লেকচার চলতে থাকে। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এক পেয়ালা চা তাঁর সম্মুখে নিয়ে আসে। তাঁর গলায় ব্যথা ছিল; কিছু উষ্ণ পান করলে তাঁর উপশম হত। তবুও তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন,- এখন থাক। কিন্তু সে ব্যক্তি তাঁর কষ্ট দেখে পেয়ালা আগের মত ধরে থাকে। তখন তিনি ঐ পেয়ালা হতে এক চুমুক পান করেন। আর তখন রমযান শরীফ। রোযার মাস। যেই তিনি চা পান করেন তখনই মৌলবিগণ চীৎকার করে বলতে লাগল, এই ব্যক্তি কখনও মুসলমান হতে পারে না। কারণ সে রমযান শরীফে রোযা রাখে না। তখন তিনি উত্তরে বলেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে আদেশ দিয়েছেন যে, রুগ্ন ব্যক্তি বা মোসাফেরকে রোযা রাখতে নেই। রোগমুক্ত হলে অথবা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পর রোযা রাখতে হবে। আমি কেবল অসুস্থ নই, মুসাফেরও বটে। কিন্তু তাঁর কথা শোনে কে? এই ক্ষিপ্তপ্রায় জনতাকে কি আর রাখা যায়? পুলিশ শত চেষ্টা করেও শান্তি স্থাপন করতে পারল না। হযরত আকদাস বসে গেলেন এবং এক ব্যক্তিকে নযম পড়ার জন্য দাঁড় করানো হল। কবিতা পড়ার সময় সকলেই চুপ করে রইল। তখন হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) আবার দণ্ডায়মান হলেন কিন্তু মৌলবিগণ তখনই পূর্বের ন্যায় গন্ডগোল আরম্ভ করে দিল। তথাপি তিনি বক্তৃতা বন্ধ করলেন না, দেখে তারা একটা দাঙ্গা বাঁধাবার চেষ্টা করতে লাগল। এমনকি তাঁর উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। পুলিশ তাদেরকে বাধা প্রদান করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের প্রবল বেগের সম্মুখে তারা

কি টিকতে পারে? বোধ হল যেন একটা বিশাল সমুদ্রের ঢেউ উত্তরোত্তর সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

যখন হযরত মির্যা সাহেব দেখতে পেলেন যে, পুলিশ কিছুই করে উঠতে পারছে না তখন তিনি বক্তৃতা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তাতেও উত্তেজনা কিছুমাত্র হ্রাস হল না। অনেকে তাঁকে আক্রমণের জন্য স্টেজের উপর আরোহণ করল। তখন পুলিশ ইন্সপেক্টর তাঁকে তাড়াতাড়ি একটা ভিতরের কামরার দিকে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ একজন সিপাহী একখানা বন্ধ গাড়ি নিয়ে আসল। এক দরজা দিয়ে পুলিশ লোকদেরকে ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছিল। অন্য এক দরজা দিয়ে মির্যা সাহেব গাড়িতে চড়ে বসেন। ইতিমধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হল যে, তিনি গাড়িতে চলে যাচ্ছেন। তখন যে জনতা লেকচার হলের চারিদিকে দাঁড়িয়ে ছিল তারা ঐ গাড়ির উপর আক্রমণ করল। এক ব্যক্তি একটা মোটা লাঠি দিয়ে তাঁকে মারতে উদ্যত হল। এই সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে একজন শিষ্য তাঁকে আসন্ন বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য বিদ্যুৎবেগে এসে উভয়ের মাঝখানে দাঁড়ালেন। যাইহোক, ভাগ্যক্রমে লাঠিটা গাড়ির দরজায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর উপর ততটা আঘাত লাগতে পারেনি নতুবা একেবারে খুন হয়ে যেতেন।

হযরত মির্যা সাহেব গাড়িতে চড়ামাত্রই গাড়ি ছেড়ে দেয়। কিন্তু গাড়ির উপর পাথর বর্ষণ হতে লাগল। গাড়ির জানালাগুলি যদিও বন্ধ ছিল তথাপি পাথরের আঘাতে খুলে যেতে থাকে, আর আমি ধরে সামলানোর চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পাথর বৃষ্টির কারণে সেটি হাত ছেড়ে পড়ে যাচ্ছিল। খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ, আমাদের কারও একটু চোট লাগে নি। কেবল একটি পাথর জানালা ভেদ করে আমার ছোট ভাইয়ের হাতে লেগেছিল। পুলিশ গাড়ির চারিদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের অনেকের আঘাত লেগেছিল। তারা লোকদেরকে সরিয়ে পথ করে দিল। তারপর কেউ গাড়ির সামনে,

কেউ পিছনে এবং কেউ ছাদের উপরে পুলিশ পাহারা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আমাদেরকে বাসায় পৌঁছে দেয়। লোক এত উত্তেজিত হয়েছিল যে, পুলিশের পাহারা সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তারা গাড়ির পিছনে দৌড়াতে লাগল। পরদিন তিনি কাদিয়ানে ফিরে আসেন।

মৃত্যুর ইলহাম এবং "আল ওসিয়্যত"

১৯০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে তাঁর উপর ইলহাম হয় যে, তাঁর মৃত্যু নিকটবর্তী। তিনি "আল্ ওসিয়্যত" নামক একখানা পুস্তক রচনা করে আপন জামা'তের মধ্যে তাঁর সন্নিকটবর্তী মৃত্যুর সংবাদ দান করেন এবং তাদেরকে নানা প্রকারে আশ্বস্ত করেন। তিনি খোদাতা'লার ইলহাম অনুসারে একটি কবরস্থান নির্মাণ করার আদেশ প্রদান করেন। ঐ কবরস্থানে জামা'তের ঐ সকল লোককেই দাফন করা হবে যাঁরা তাঁদের সম্পত্তির এক দশমাংশ ইসলাম প্রচারের জন্য দান করবেন। খোদাতা'লা তাঁকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, এই কবরস্থানে কেবল ঐ সকল লোকই স্থান পাবে যারা জান্নাতের অধিকারী। এইরূপে প্রদত্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি এও ভবিষ্যদ্বাণী করে যান যে, তাঁর জামা'তের হেফাজত ও শাসন সংরক্ষণের জন্য খোদাতা'লা তাঁর মৃত্যুর পর তেমন বন্দোবস্ত করবেন যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের তিরোধানের পর ব্যবস্থা করেছিলেন এবং জামা'তের স্বার্থ রক্ষার জন্য এমন সব নেতার অভ্যুদয় হবে যাঁরা হযরত রসূলে করীম (সা.) এর এন্তেকালের পর হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) যেরূপ কাজ করেছিলেন, সেরূপই কর্ম করবেন। "আল ওসিয়্যত" প্রকাশিত হওয়ার পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত জামা'তের শিক্ষা, ইসলাম-প্রচার প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সমাধার জন্য এবং মাদ্রাসা ও সংবাদপত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি ছিল। বেহেশ্‌তী মাকবরার কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি নূতন কমিটি গঠিত হয়।

সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠা

কিন্তু তাঁর অনুসারীবর্গের প্রার্থনা অনুসারে তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভিন্ন ভিন্ন কমিটি সম্মিলিত করে এক আঞ্জুমান গঠন করেন এবং তার হাতে ধর্ম শিক্ষা, লৌকিক শিক্ষা, রিভিউ অব রিলিজিয়ানস্ পত্রিকা, মাকবরায়ে বেহেশ্‌তী প্রভৃতি সমস্ত বিভাগেরই পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। এই আঞ্জুমানের নাম "সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া" রাখা হয়।

মোবারক আহ্‌মদের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী

১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হযরত আহ্‌মদের পুত্র মোবারক আহমদের আট বছর ছয়মাস বয়সে মৃত্যু হয়। এই বালকের মৃত্যু সংবাদ আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়েই অবগত করেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এই সংবাদ মুদ্রিত করে সর্ব-সাধারণের মাঝে প্রকাশ করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী যথা সময়ে পূর্ণ হয়।

এই বছর ভিন্ন ভিন্ন শহরে সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার শাখা স্থাপনের মনস্থ করা হয়।

আমেরিকার আগন্তুক

এই বছর আমেরিকা হতে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক হযরত আহ্‌মদ (আ.) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কাদিয়ানে আগমন করেন। তাঁদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে তিনি কথাবার্তা বলেন এবং হযরত ঈসা (আ.) এর দ্বিতীয় বার আগমনের গূঢ় অর্থ কি তা পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দেন।

এই সময় পঞ্জাব গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন শুরু হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর জামা'তকে সর্ব বিষয়ে গভর্ণমেন্টের অনুগত থাকার জন্য বিশেষ আদেশ প্রদান করেন। তাঁর জামা'তের লোকগণ বিভিন্ন স্থানে কোনও প্রকার লোভের বশবর্তী না হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে

উত্থিত অশান্তি দমনের জন্য নানা প্রকারে সহায়তা করেন।

আর্য সমাজের ধর্মসভা

ডিসেম্বর মাসে আর্য সমাজ লাহোরে এক ধর্মসভার অনুষ্ঠান করে এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণকে উক্ত সভায় যোগদান করতে আহ্বান করে। কিন্তু সভায় যোগদানের এই শর্ত রাখা হয় যে, কোন ধর্মের লোক অন্য ধর্মকে অযথা আক্রমণ করতে পারবে না। আর্য সমাজিগণও এই শর্তের অধীনে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। তাঁরা হযরত আহ্‌মদ (আ.) কেও উক্ত সভায় যোগদান করতে অনুরোধ করেন। তাঁদের কার্যকলাপে তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হলেও হযরত মির্যা সাহেব উক্ত অনুরোধের প্রত্যুত্তরে তাদেরকে যুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্বাক করার জন্য স্বরচিত একটি প্রবন্ধ উক্ত সভায় পাঠ করার জন্য প্রেরণ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি আর্য সমাজকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শান্তির দিকে আহ্বান করেন। তাদের সমক্ষে প্রীতিপূর্ণ সরল চিত্তে সুকোমল ভাষায় ইসলামের সৌন্দর্যগুলি প্রকাশিত করেন। আমাদের জামা'তের প্রায় পাঁচশত লোক টিকিট কিনে উক্ত সভায় উপস্থিত হন। আমাদের অনুসরণ করে অন্যান্য অনেক মুসলমানও উক্ত সভায় যোগদান করতে যায়। যখন আর্য সমাজের প্রবন্ধ পাঠের পালা উপস্থিত হয়, তখন তারা নিতান্ত কদর্য ভাষায় আমাদের হযরত নবী করীম (সা.) কে গালাগালি দিতে থাকে। আমরা নবী করীম (সা.) এর পবিত্র শিক্ষানুযায়ী চুপ করে শুনতে থাকি, কেউ দাঁড়িয়ে এ কথাও বলল না যে, আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

মুসলিম লীগ সম্বন্ধে হযরত সাহেবের মত

১৯০৮ সনে ২১শে মার্চ তারিখে পঞ্জাব গভর্ণমেন্টের ফাইনেনসিয়েল কমিশনার স্যার উলসন সাহেব কাদিয়ানে শুভাগমন করেন। গভর্ণমেন্টের উচ্চ পদস্থ কোনও কর্মচারীর এই প্রথম কাদিয়ানে আগমন। এজন্য হযরত

সাহেব স্বীয় জামা'তকে অভ্যর্থনা করে আনার আদেশ দেন। স্কুলের মাঠে তাঁর তাঁবু খাটান হয়, জামা'তের পক্ষ হতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এই সময়ে হযরত সাহেবের শত্রুগণ তাঁর সম্বন্ধে একটি গুজব রটনা করেছিল যে, তিনি ভিতরে ভিতরে গভর্ণমেন্টেরই বিরুদ্ধাচরণ করছেন। সরকার বাহাদুরের সঙ্গে তাঁর বংশ পরম্পরাগত সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না। এটিও তাঁর গুপ্ত শত্রুতার প্রমাণ বলে ইঙ্গিত করে। হযরত সাহেব এই সুযোগে নিজ কার্য দ্বারা এই অপবাদ দূর করেন। তিনি স্বয়ং ফাইনানসিয়েল কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তাঁর আটজন শিষ্যও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কমিশনার সাহেব তাঁর তাঁবুর দ্বারদেশ পর্যন্ত এসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে যান এবং তাঁর জামা'ত সম্বন্ধে ও অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ে অনেক আলাপ করেন। এই সকল কথা বার্তার মধ্যে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই সময় 'মুসলিম লীগ' নূতন স্থাপিত হয়েছে। ইংরেজগণ উৎসাহের সঙ্গে এর সমর্থন করেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, কংগ্রেসের অনিষ্টকর দোষগুলি নিবারণকল্পে এই দল একটা শক্তিশালী অস্ত্রের কাজ করবে। কোনও কোনও শাসনকর্তা সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে মুসলিম লীগে যোগদান করতে ইঙ্গিতও করতেন। কমিশনার সাহেব মুসলিম লীগ সম্বন্ধে হযরত মির্যা সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমি একে পছন্দ করি না।' কমিশনার সাহেব এর গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। হযরত সাহেব বলেন, এরা যে পথ অবলম্বন করেছে তাতে যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে। কমিশনার সাহেব বলেন, আপনি একে কংগ্রেসের মত মনে করবেন না। কংগ্রেস যেভাবে স্থাপিত হয়েছিল তাতে এর দাবি যে আতিশয্যপূর্ণ হবে তা প্রথমেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু মুসলিম লীগের বুনিয়াদ এমন লোকের হাতে পড়েছে এবং এর পরিচালনার নিয়মাবলী এমন ভাবে গঠিত হয়েছে যে, এটি কখনই কংগ্রেসের রং ধরতে পারবে না। কমিশনার সাহেবের এই কথা শুনে হযরত সাহেবের একজন শিষ্য

খাজা কামালউদ্দিন তার সমর্থন করেন। তিনি বলেন, 'আমিও এর একজন মেম্বার। এর প্রবর্তিত নিয়মাবলী এমন সুকৌশলে প্রস্তুত করা হয়েছে যে, কোনও ভয়ের কারণ থাকতে পারে না।' এই খাজা কামালউদ্দিনই ওকিং মিশনের স্থাপন কর্তা এবং 'মুসলিম ইন্ডিয়া' নামক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উভয়ের মন্তব্য শুনে বলেন, "আমি তো স্পষ্ট অনুভব করছি যে, মুসলিম লীগও কালে কংগ্রেসের বর্ণ পরিগ্রহ করবে। আমি এইরূপে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া বিপদজনক মনে করি।" তাঁদের আলোচনা তো এই খানেই সমাপ্ত হয়। কিন্তু যাঁরা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর খবরাখবর রাখেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কথাগুলি কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে।

শেষ লাহোর যাত্রা

এই বছর ২৬ শে এপ্রিল তারিখে আমার ওয়ালেদা (মাতা) সাহেবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাত্রাকালে তাঁর উপর এই ইলহাম হয় "মাবাশ ঈমান আয বাযি এ রোযগার" অর্থাৎ কালের লীলার উপর নিশ্চিন্ত থেকো না। তিনি বলেন এই ইলহাম দ্বারা বোধ হচ্ছে যে, কোন ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হবে।" ঘটনাক্রমে ঐ দিন রাতে আমার ছোট ভাই মির্যা শরীফ আহ্‌মদ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এজন্য সে দিন রওনা স্থগিত হয়। পরদিন বাটালা স্টেশনে যাওয়ার পর জানা গেল যে, সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায় গাড়ীর সংখ্যা যথেষ্ট নয়। গাড়ি রিজার্ভ করা গেল না। দুই তিন দিন বাটালায় অপেক্ষা করতে হল। হযরত সাহেব বাড়ি এসে বলেন, "আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হতে ইলহাম হওয়া আর এদিকে নানা বাধা আরম্ভ হওয়ার ভিতর রহস্য আছে। আমার বিবেচনায় কিছুকাল বাটালায় অবস্থান করা সঙ্গত। এতে আবহাওয়ার বদল হবে। চিকিৎসার জন্য একজন লেডি ডাক্তার ডাকা হোক।" কিন্তু পরিবারবর্গের সকলে জিদ ধরে বসলেন, লাহোর যেতেই হবে।

অবশেষে দুই তিন দিন অপেক্ষার পর তিনি লাহোরে গেলেন। লাহোরে পৌঁছাতেই এক তুমুল আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। মৌলবিগণ পূর্বের ন্যায় তাঁর বিরুদ্ধে একত্র হন। তিনি যে বাড়িতে বাস করতেন তার নিকটেই একটা খোলা মাঠ ছিল। সেখানেই তাঁর বিরুদ্ধে সভার পর সভা হতে লাগল। প্রত্যহ আসরের নামাযের পর রাত ৯টা/১০টা পর্যন্ত মিটিং হতে লাগল। এই সকল সভায় তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়া হত। তাঁর বাড়িতে ঢোকার একটি মাত্র রাস্তা ছিল। সুতরাং তাঁর শিষ্যগণের বড়ই কষ্ট হতে লাগল। তিনি তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলতেন,'তোমরা সহ্য করে থাকবে। গালি দ্বারা আমার কোন ক্ষতিই হবে না। তোমরা একটুও প্রত্যুত্তর না করে চুপ করে যাতায়াত করবে। ঐ দিকে চেয়েও দেখবে না।' এবার কিছুকাল লাহোরে অবস্থান করবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁর জামা'তের অনেক লোক সে স্থানে সমবেত হতে লাগল। সব সময়েই মানুষের ভিড় থাকত। অন্য লোকও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত।

সেই সময়ে হিন্দুস্থানের সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকগণ বরং প্রকৃতপক্ষে সমুদয় পৃথিবীর উচ্চ বংশের লোকেরাই ধর্মের প্রতি একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁদেরকে কিছু উপদেশ দেবার জন্য তাঁর পরিচিত লাহোরের একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত গায়ের আহ্‌মদী দ্বারা তাদেরকে নিমন্ত্রণ করালেন। আহারের পূর্বে তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করেন। বক্তৃতা কিছু লম্বা হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির নিতান্ত উদ্বিগ্ন ভাব দেখে সকলেই বলে উঠলেন, আহার তো আমাদের রোজই হয়ে থাকে কিন্তু এই আধ্যাত্মিক আহার কেবল আজই আমাদের ভাগ্যে ঘটল। প্রায় দুই ঘন্টা পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতা হয়। পরদিন এই বক্তৃতা সম্বন্ধে গুজব ওঠে যে, মির্যা সাহেব তাঁর নবুওয়তের দাবি প্রত্যাহার করেছেন। লাহোরের কতিপয় উর্দু দৈনিক সংবাদপত্রেও ঐ খবর প্রকাশিত হয়। হযরত সাহেব তখনই ঐ সংবাদের এক প্রতিবাদ প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি কখনও নবুওয়তের দাবি প্রত্যাহার করেন নি। তিনি কেবল এই

কথাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, তিনি কোন নূতন শরীয়ত আনয়ন করেন নি। শরীয়ত তাই যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) আনয়ন করেছেন।

হুযুর (আ.) এর তিরোধান

হযরত আহ্‌মদের সর্বদাই পেটের অসুখ ছিল। দাস্ত হত। লাহোর আগমনের পর তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। সর্বদাই লোক তাঁর সাক্ষাৎ লাভের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করত। এজন্য তাঁর একটুও বিশ্রামের অবসর হত না। এই অবস্থার মধ্যে তাঁর উপর এই ইলহাম হয়, **"আর রাহিলু সুম্মার রাহিলু"** (যাত্রার সময় আগত; যাত্রার সময় আগত)। এই ইলহামের বিবরণ অবগত হয়ে তাঁর শিষ্যবর্গ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তখনই কাদিয়ান হতে এক ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁরা মনে করলেন যে, এই ইলহাম ওই ব্যক্তির সম্পর্কে হয়েছে। এর ফলে তাঁরা অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। এ বিষয়ে হযরত সাহেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন – না, এই ইলহাম জামা'তের একজন অতি উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে হয়েছে। এই সংবাদে আমার ওয়ালেদা সাহেবা (হযরত সাহেবের সহধর্মিণী) অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে তাঁকে বলেন, 'চলুন, কাদিয়ানে ফিরে যাই।" তিনি উত্তরে বলেন, "এখন কাদিয়ানে ফিরে যাওয়া আমার সাধ্যাতীত। যদি খোদাতা'লা নিয়ে যান তবেই যেতে পারব।"

হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রস্তাব

আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন ইলহাম সত্ত্বেও তিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজের এতটুকুও পরিবর্তন করেন নি। সমস্ত কাজ ঠিক পূর্বের ন্যায়ই চলতে থাকে। এইরূপ পীড়িতাবস্থায়ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বভাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি এক বক্তৃতা করবেন বলে স্থির করেন। বক্তৃতা লেখা আরম্ভ হল। এই প্রবন্ধের নাম 'পয়গামে সুলেহ' রাখা হয়। এর ফলে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। যে দিন তাঁর বক্তৃতা লেখা শেষ হয় সেই

দিন রাতে এক ইলহাম হয়ঃ **"মাকুন তাকিয়া বর উমর না পায়দার"** অর্থাৎ ভঙ্গুর জীবনের উপর ভরসা কর না। তিনি তৎক্ষণাৎ এই ইলহাম তাঁর পরিবারের মধ্যে প্রকাশ করে বলেন, "এটি আমার সম্বন্ধে বলা হয়েছে।" সেই দিন বক্তৃতা রচনা শেষ করে ছাপাবার জন্য পাঠানো হল।

রাতে তাঁর দাস্ত হতে থাকে; তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি আমার ওয়ালেদা সাহেবাকে ঘুম হতে জাগালেন। তিনি হযরতের দুর্বল অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কেমন মনে হচ্ছে?' তিনি বলেন, "আমি যেমন বলতাম"(অর্থাৎ মৃত্যু রোগ)। এরপর তাঁর আর একবার দাস্ত হয়। এর ফলে তিনি একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়েন। তিনি আদেশ করেন, "মৌলবি নূরুদ্দীন সাহেবকে ডেকে আন।" (উক্ত মৌলবি সাহেব সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে যে, তিনি একজন বিখ্যাত হেকিম ছিলেন।) তারপর হযরত সাহেব বলেন, "মাহমুদ (অত্র গ্রন্থকার) ও মীর সাহেবকে (তাঁর শ্বশুর) জাগাও।" আমার বিছানা তাঁর বিছানার নিকটেই ছিল। আমি উঠে দেখি, তিনি খুব অস্থির ছিলেন। একজন ডাক্তার এসে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। কিন্তু কোন ফল দেখা গেল না। শেষে তাঁর শরীরে কয়েকবার ইঞ্জেকশন করা হয়। অতঃপর তিনি শুয়ে পড়েন। যখন ফজর হয় উঠলেন; উঠে নামায পড়লেন। তাঁর গলা একেবারে বসে গিয়েছিল। কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। দোওয়াত-কলম আনতে বললেন; কিছু লিখতে পারলেন না। কলম হাত হতে পড়ে গেল। আবার শুয়ে পড়লেন। একটু পরে তন্দ্রা ভাব আসল। বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় তাঁর পবিত্র আত্মা সেই রাজাধিরাজের দরবারে উপস্থিত হল, যাঁর ধর্মের সেবায় তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে। ("ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)"। অসুখের সময় স্রেফ একটা শব্দই উচ্চারিত হত তাঁর পবিত্র জবান হতে এবং ঐ শব্দটি ছিল,'আল্লাহ্'।

তাঁর মৃত্যুর খবর বিদ্যুতের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভিন্ন ভিন্ন

জামা'তের নিকট তারযোগে সংবাদ পাঠান হল। সেই দিন সন্ধ্যায় ও পরদিন সকালে বিভিন্ন খবরের কাগজের মাধ্যমে এই মহাপুরুষের মৃত্যু সংবাদ সারা হিন্দুস্থানে প্রচারিত হল।

তিনি স্বীয় বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ও শত্রুগণের সঙ্গে যে শিষ্টাচার ও ভদ্র ব্যবহার করে গিয়েছেন তা যেমন একদিকে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, অপর দিকে তাঁর মৃত্যুতে যে তাদের আনন্দধারা ছিল তাও বিস্মৃত হবার নয়। লাহোরের একজন সাধারণ লোক আধ ঘন্টার মধ্যেই যে গৃহে তাঁর পবিত্র লাশ রক্ষিত ছিল তার নিকটবর্তী এক স্থানে এসে নানাবিধ আনন্দগীত গেয়ে স্বীয় হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছিল। কেউ কেউ নানা প্রকার সং সেজে তাদের অন্তরের বিভীষিকাময় নীচাশয়তা প্রদর্শন করতেও কুণ্ঠাবোধ করে নি।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কিরূপ প্রীতিপূর্ণ ছিল তা এই ঘটনা হতেই প্রতীয়মান হবে। অনেকের মানসিক অবস্থা এরূপ হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর পবিত্র লাশ চোখের সামনে দেখেও যেন তাদের মন কিছুতেই মানতে চাইল না যে, তাদের প্রিয়তম বন্ধুর সঙ্গে তাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটে গেছে। প্রথম মসীহ্‌র শিষ্যগণের সঙ্গে দ্বিতীয় মসীহ্‌র এই প্রভেদ ছিল যে, প্রথম মসীহ্‌র শিষ্যগণ স্বীয় প্রভুকে ক্রুশ হতে জীবিতাবস্থায় নেমে আসতে দেখে হতভম্ব হয়েছিল; আর বর্তমান মসীহ্‌র শিষ্যগণ তাদের মসীহ্‌র মৃত্যু হতে দেখে হতভম্ব হল।

আজ হতে তেরোশত বছর পূর্বে সেই যে এক মহাপুরুষ "খাতামান্নাবীঈন" সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রূপে ধরাভূমিতে আগমন করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে তৎকালীন কবি মর্মাহত স্বরে গেয়েছিলেন ঃ-

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِىْ فَعَمِىَ عَلَىَّ النَّاظِرُ

مَنْ شَاءَ بَعْدَکَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْکَ كُنْتُ اُحَاذِرُ

অনুবাদঃ "তুমি আমার চোখের পুত্তলি ছিলে। তোমার মৃত্যুতে আমার

চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন হতে আর কারও উপর মৃত্যুর ছায়া এসে পড়ল কিনা, তা আমি জানতে চাই না। কারণ আমি এত দিন কেবল তোমার মরণের ভয়েই ভীত ছিলাম।"

(সিরাত হাস্‌সান বিন সাবিত, লেখক- খালদুন আল কনানী, পৃ. ৪৮, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে দামিস্ক হতে প্রকাশিত এবং আস্‌ সিরাতুল হালবিয়া, ৩'য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩,৩৮৪, পাদটীকা, মিশর হতে প্রকাশিত)

আজ তেরোশত বছর পরে সেই নবী করীম (সা.) এর একজন গোলামের মৃত্যুতেও ঠিক ঐ রকমের আর এক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হল। যাঁরা তাঁকে সনাক্ত করেছিলেন তাঁদের চোখের সামনে দুনিয়া ও তার সুখ সবই নিতান্ত হীন বলে গণ্য হত। তাঁদের দৃষ্টি পার্থিব সুখ অতিক্রম করে পরকালের উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। তাঁর প্রস্থানের আজ আট বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁদের মনের এমনি অবস্থা যে শত বৎসর অতীত হলেও যেদিন তাঁদের খোদাতা'লার প্রিয় রসূল তাঁদেরই মধ্যে চলাফেরা করতেন সেই দিনের কথা তাঁরা কখনই ভুলতে পারবেন না।

দুঃখ বেদনা মানুষকে দিশাহারা করে তোলে। আমিও হযরত মসীহ্‌ মাওউদের (আ.) মৃত্যুর কথা বলতে বলতে কোথায় এসে পড়েছি। আমি বলছিলাম যে সাড়ে দশটার সময় তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তখন তাঁর পবিত্র লাশ কাদিয়ানে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। সন্ধ্যার সময় তাঁর জামা'তের লোকেরা বিষন্ন মনে শবদেহ নিয়ে গাড়িতে রওনা দেন। যে ইলহাম কিছুকাল পূর্বে সংবাদপত্রসমূহে তিনি প্রচার করেছিলেন এবং যেখানে বলা হয়েছিল যে 'তাঁর শবদেহ কাফনে জড়িয়ে কাদিয়ানে আনা হয়েছে' আজ সেই ইলহাম বাস্তবে পূর্ণ হল।

বাটালা পৌঁছানোর পর শীঘ্রই তাঁর শবদেহ কাদিয়ানে আনা হয়। কাদিয়ানে তখন বাইরের জামা'তসমূহের শত শত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সকলে হযরত মৌলবি হেকিম নূরুদ্দীন সাহেবকে তাঁর খলিফা বলে একবাক্যে

স্বীকার করে তাঁর হাতে বয়া'ত গ্রহণ করেন। "আল-ওসিয়্যত" নামক পুস্তকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা এইক্ষণে এইরূপে পূর্ণ হল। তিনি বলেছিলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মৃত্যুর পর খোদাতা'লা যেমন বিশ্বাসীগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) কে দাঁড় করিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর (আ.) মৃত্যুর পরও তাঁর জামা'তের জন্য একজনকে দাঁড় করাবেন। অতঃপর যুগ খলিফা তাঁর জানাযা নামায পড়ান। দ্বিপ্রহরের পর তাঁর দাফন কার্য সমাধা হয়। সেই সঙ্গে তাঁর আর একটি ইলহাম পূর্ণ হল। "২৭ তারিখে (আমার সম্বন্ধে) ঘটনা।" এই ইলহাম তিনি ১৯০৭ সনে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচারিত করেন। ২৬ শে মে তারিখ (১৯০৮) তাঁর মৃত্যু হয় এবং ২৭ তারিখে দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। উক্ত ইলহামের সঙ্গে আরও একটি ইলহাম ছিলঃ **'ওয়াক্ত রসিদ'** (সময় আগত)। এখন এর অর্থও পরিষ্কার হয়ে গেল।

তাঁর মৃত্যুর পর ইংরেজী ও দেশীয় সংবাদপত্রসমূহে ঘোর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও একথা স্বীকৃত হয়েছে যে, বর্তমান যুগে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী একজন মহাপুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।